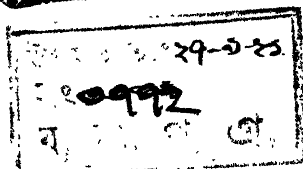
সাহিত্য-কুঞ্জ।

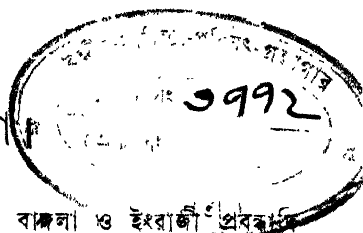


শ্রীজীবনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সোম, বি-এল।
প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ আট আনা।

হাওড়া, ৪নং তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে
শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।



ভূমিকা।

গ্রন্থকার অতি অল্প বয়স হইতেই বাঙ্গলা ও ইংরাজী প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকেও তাঁহার বাল্যকালের দুই একটী বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আছে। তাঁহার লেখার সকলগুলিতেই তিনি যেরূপ অনুসন্ধিৎসা, গভীর গবেষণা, বহুদর্শিতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা-ভাষায় লিখিত অতি অল্প পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, আজকাল সত্য অপেক্ষা কল্পনার আদর কিছু বেশী। গ্রন্থকার এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার রচিত সন্দর্ভগুলি এতদিন অতি সন্তর্পণে কোন কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছিলেন, পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার কখনও ছিল না। কেবলমাত্র এই নগণ্য ভূমিকা লেখকের আগ্রহেই এক্ষণে সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। পরিশেষে ইংরাজী-ভাষায় লিখিত চারিখানি পত্র আছে। অপরগুলি এখন পর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই।

৩রা অগ্রহায়ণ,
হাওড়া,
১৩২১ সাল।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২	১৪	মত	মতে।
৪	৪	প্রভাবে	অভাবে।

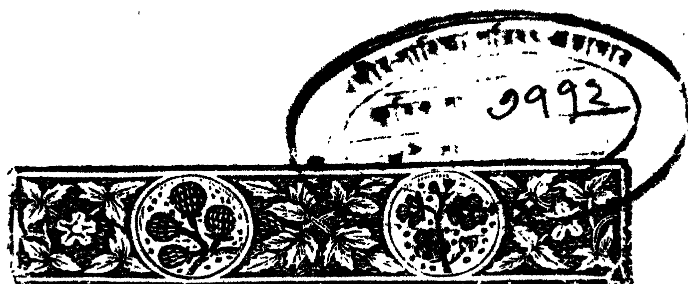
৪ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে "মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ" না হইয়া, "মৃত্তিকা ও জল পরস্পর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নি ও বায়ু অদৃশ্য এবং মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ." এইরূপ পাঠ হইবে।

৫	১২	দ্বারা	দ্বার।
৬	৬	ফৌড্রাসন্	ফৌড্রস্।



সূচী।

পরিশিষ্ট।



সাহিত্য-কুঞ্জ।

সৃষ্টিপ্রবাহ।

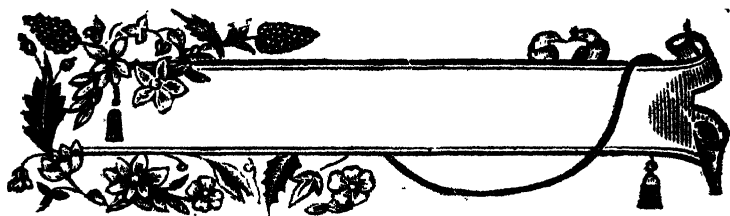
সৃষ্টিপ্রবাহ অনন্তকাল হইতে অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে। কল্পে কল্পে এক জগতের ধ্বংশে অন্য এক জগতের সৃষ্টি হইতেছে। বিধাতার রাজ্যে উৎপত্তি ও লয় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। জগতের উৎপত্তি ও ক্রম-বিকাশের কথা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। যাহার আদি আছে তাহার নিধনও আছে। যে সূর্য্য এক্ষণে পৃথিবীর জীবন স্বরূপ, ক্ষণকালের জন্য যাহার আলোক ও তাপ না পাইলে আমরা অভাব অনুভব করি, সেই সূর্য্যই একদিন নীহারিকা ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না, এ কথা আধুনিক বিজ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিতেছে। আমাদের পুরাণেও এই সকল কথা পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে যে দশ অবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে জীবের ক্রমোন্নতির আভাস স্পষ্ট আছে। পঞ্চভূতের মধ্যে ব্যোম, মরুত ও তেজ মহাভূতে কোন জীব নিরালম্বভাবে বাস করে কিনা তাহা অজ্ঞাত আছে। প্রথমে জীবের সৃষ্টি জলে প্রত্যক্ষ হয়। ভগবান্ মীন রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীব সৃষ্টির পথ সুগম করিয়াছিলেন, জল-

ভাগ জীবের বাসোপযোগী হইলে বরাহ সৃষ্টি হয়। আজকাল আমরা "প্রটোপ্লাজম" (Protoplasm) আবিওজিনিসিস্ (Abiogenesis) ও মনাডের (Monad) কথা সর্ব্বদাই শুনি বটে, কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ভগবান যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। হেল্‌মজ বলেন, "আকাশে" যে "কসমিক ডাষ্ট" অর্থাৎ ধূলিকণা আছে তাহা ঘনীভূত হইলে নূতন জগতের সৃষ্টি হইতে পারে, ফ্লামারিও বলেন যে সূর্য্যগণ নিভিলে যদি পুনরায় জ্বালাইবার ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে আকাশে তারার অস্তিত্ব থাকিত না।" পুরাতন সূর্য্য লোপ পাইলে যে নূতন সূর্য্য তাহার স্থান অধিকার করে, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের আলোচনায় তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। লীলাময়ের লীলায় সূর্য্যও বাদ পড়েন নাই।

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে সূর্য্যরূপে বিরাট গোলক এক সময়ে সমগ্র সৌরজগৎ ব্যাপিয়া ছিল। ক্রমে উহা সঙ্কুচিত হইতেছে। কণাদের মত পার্থিব পদার্থ মাত্রেরই মূলে পরমাণু ও তাহাদের সমবায় দৃষ্ট হয়, কিন্তু একের বিকারে অপরের উদ্ভব হয় শাস্ত্রে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ঋগ্বেদে ঈশ্বরই সৃষ্টির সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন বলিয়াও উক্ত হইয়াছে --

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥"

আবার কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, সংঘর্ষণ ভিন্ন সৃষ্টি হইতে পারে না। তবে কি ঈশ্বরের অভিপ্রায় যে সূর্য্য জ্যোতিহীন হইলে সংঘর্ষণে আবার জ্যোতির্ম্ময় হইবে অথবা সূর্য্য শীতল ও কঠিন হইলে কোন নীহারিকা সূর্য্যে পরিণত হইয়া সৌরজগতের অভাব পূরণ করিবে?



জীবাত্মা।

জীবাত্মার বিনাশ আছে কি না ইহা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। স্থূল দৃষ্টিতে যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে জীবাত্মার বিনাশ আছে স্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। অধিকন্তু বিনাশ নাই বলিবার বিশেষ কারণ বর্ত্তমান। ইহার সহিত পরকালের সম্পর্কও নিতান্ত ঘনিষ্ট। পরকাল সম্বন্ধে জ্ঞানালোক সম্পন্ন হিন্দুগণের সহিত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতভেদ লক্ষিত হয় না। ফরাসী পণ্ডিত ডিবারু প্রথমে ধর্ম্মে অনাস্থাবান ছিলেন। পরে যখন বুঝিলেন আত্মার বিনাশ নাই, তখন ঘোর আস্তিক হইলেন; পরকাল সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সেক্ষপীয়ারের হ্যামলেট পাঠ করিলে জানা যায় যে পরকাল সম্বন্ধে তাঁহারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সীসিরো বলিয়াছেন মন পূর্ব্ব হইতেই জানে যে জীবাত্মার বিনাশ নাই, এবং পুনর্জ্জীবন অবশ্যম্ভাবী। পারস্যদেশীয় পণ্ডিত নাসিরুদ্দীন সিসোরোর মত সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক জীবাত্মা কি? শরীর মধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রকাশমান যে মানসিক জ্যোতিঃ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাই জীবাত্মা—অথবা * * * জীবো জীবস্য জীবনং (শ্রীমদ্ভাগবত)। ঐ জীবের ধ্বংস নাই (ভৃগু)। দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহান্তরে গমন

করে। কেবল শরীর বিশীর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়। সমিধ সকল ভস্মীভূত হইলে অগ্নি যেমন অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ দেহের অবসান হইলে শরীরস্থিত জীব অদৃশ্য হইয়া থাকে। দাহ্য বস্তুর শেষ হইলে অগ্নি আশ্রয় প্রভাবে আকাশে বিলীন হয়, ঐরূপ জীবাত্মাও শরীর পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে। এবং উভয়েই আমাদের নয়নগোচর হয় না। অগ্নি জ্ঞানময় জীব স্বরূপ। উহা বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া দেহ মধ্যে অবস্থান করে। নিশ্বাস পবন রুদ্ধ হইলেই উহার নাশ হয় এবং উহার নাশ হইলে দেহ ভূতলে নিপতিত ও বিলীন হইয়া যায়। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় পদার্থের বায়ু আকাশের এবং জ্যোতিঃ বায়ু অনুগমন করে। আকাশে অগ্নি ও বায়ু ইহারা যেমন পরস্পর একত্র অবস্থান করিতেছে তদ্রূপ জল ও মৃত্তিকা ও জল দৃশ্য পদার্থ। এই মেদ, মাংস শোণিত স্নায়ু ও অস্থিসমাকীর্ণ দেহ বিদীর্ণ করিলেও জীবাত্মা নয়নগোচর হয় না। জীবাত্মা কর্ণের সাহায্যে শ্রবণ এবং চক্ষুর সাহায্যে দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় মনই শ্রবণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত। লোকে নিদ্রায় অভিভূত হইলে শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, স্পর্শ আস্বাদন অথবা হর্ষ, বিষাদ ক্রোধ, ভয়, ইচ্ছা, দ্বেষ, চিন্তা ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা থাকে না, অতএব যখন মনই সমুদায় ক্রিয়া করিতে লাগিল, তখন অনর্থক জীবাত্মা স্বীকার করিবার তাৎপর্য্য কি? কিন্তু মন পঞ্চভূত হইতে পৃথক নহে 'উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পমিন্দ্রিয়ঞ্চ সা ধর্ম্মাৎ (সাঙ্খ্যদর্শন) কিম্বা—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিরেবচ ;
অহঙ্কার ইতিয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ; ;

(গীতা)

সুতরাং মনের দ্বারা শারীরিক সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় না। একমাত্র অন্তরাত্মা লোকের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া শারীরিক কার্য্য সাধন করিতেছে। উহারই সুখ দুঃখ অনুভব হয়। আত্মার সহিত বিয়োগ হইলে দেহ আর কিছু অবগত হইতে সমর্থ হয় না? যখন লোকের শরীরস্থিত অগ্নি স্বরূপে আত্মার বিয়োগ নিবন্ধন লোকের রূপ স্পর্শনাদি জ্ঞান কিছুমাত্র থাকে না তখনই তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয়। এই সমুদায় জগৎ জলময়, জলজীবগণের মূর্ত্তি স্বরূপ। লোক বিধাতা ব্রহ্মা আত্মরূপে সমুদায় জীবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মা সামান্য গুণ সমুদায়ে সংযুক্ত হইলে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং ঐ সকল গুণ হইতে বিযুক্ত হইলে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে আত্মা পদ্ম মধ্যে জলবিন্দুর ন্যায় দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে সত্ব রজ ও তম এই তিনটি সুখ দুঃখ ভোগের দ্বারা উহারা আত্মার প্রভাবে চেষ্টাযুক্ত হইয়া কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। পরমাত্মা নির্গুণ; উহার সহিত কোন কার্য্যেরই সংশ্রব নাই। "জীবাত্মার বিনাশ নাই; যাহারা আত্মা ধ্বংস নিরূপণ করে তাহারা মূঢ় জীবাত্মা কেবল এক দেহ হইতে অন্য দেহে গমন করে; দেহান্তরে গমনই তাহার মৃত্যু।" * প্রফেসর অলিভার লজ বলেন (Lodge) A conviction of the certainty of future existence has to me personally been brought home on purely scientific grounds অর্থাৎ আত্মা যে অবিনশ্বর তাহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা জানিতে পারিয়াছি ওয়ালেস (A. R. Wallace) ক্রুকস্ (Sir W. Crookes F. R. S.) প্রভৃতি একালের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও এই কথা বলিয়াছেন কিন্তু সক্রেটিস্ (Socrates) কোন

---

* কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত।

কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই তাহা (Phædrus) ফীড্রাসন্ পাঠে জানা যায়। গীতা বলেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা,
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।" (২য় অঃ ২২)



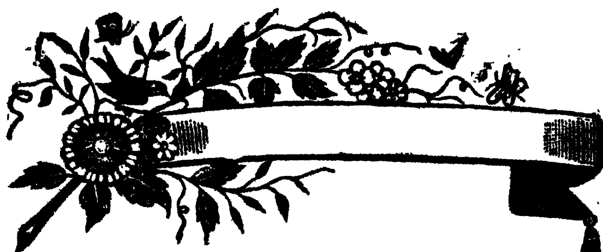


দৈবশক্তি।

ইহজীবনে অনেকের দ্বারা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। সে সকল ঘটনা আলোচনা করিলে, স্থূল-দৃষ্টিতে তাহার-মূল-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। সেরূপ অনেক ঘটনার মূল,—কেহ নির্দ্দেশ করেন, দৈবশক্তি; কেহ নির্দ্দেশ করেন, পূর্ব্বস্মৃতি। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে আমরা মনুষ্য-জীবনের কয়েকটী অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি সেগুলি—হয় দৈবশক্তি—নয় পূর্ব্বস্মৃতি।

বিখ্যাত হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সিডিস সাহেবের দশ-বৎসরবয়স্ক পুত্রের ক্ষমতা দেখিয়া পাশ্চাত্য-জগৎ চমৎকৃত হইয়াছে। বালক উইলিয়ম জেমস্ সিডিস গণিত-শাস্ত্রের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, সে নাকি অনেক শ্বেত-শ্মশ্রু অধ্যাপকের গুরুস্থানীয় হইয়াছে। দৈবশক্তির প্রভাবে মানুষ সমস্তই করিতে পারে। যাঁহারা দৈবশক্তিতে পরিচালিত হইয়া অনন্যসাধারণ কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। আমাদের শঙ্করাচার্য্য বাত্রিশ বৎসর বয়সে ইহজগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবলমাত্র গ্রন্থ-প্রণয়নের বিষয় চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। আমরা জানি দান্তে (Dante) নয় বৎসর বয়সে বিয়াট্রিসের উদ্দেশ্যে

ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন ; টেসো (Taaso) ছয় মাস বয়সের সময় কথা কহিতে পারিতেন এবং সাত বৎসর বয়সে লাটিন ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া দশ বৎসর বয়সে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পোপের (Pope) বার বৎসরের কবিতা (Ode on Solitude) অতীব প্রশংসনীয়। শিলার (Schiller) তের বৎসর বয়সে বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ (Raubar) লিখিয়াছেন। মেয়ারবিয়ার (Meyerbeer) পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াই পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। ভার্ণেট (C. J. Vernet) চারি বৎসরের সময়েই চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। ভিকন্টি (E. Q Visconti) প্রতিভার তের মাস বয়স হইতেই বুঝিতে পারা গিয়াছিল এবং তিনি ছয় বৎসরের সময় হইতেই ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়াছিলেন। ইকরণ (Eichorm), মুজর্ট (Mozart) ও ইবলার (Eybler) প্রভৃতি অনেকেই ছয় বৎসর বয়সে কলাবিদ্যায় কৃতলক্ষণ হইয়াছিলেন। কেবল মাত্র একটী পাত্রের উপর ছুরীর আঘাতে পাস্কেল (Pascal) শব্দ-তত্ত্ব লিখিয়াছেন। জন বেনিয়ান (John Bunyan) ভাল লেখাপড়া জানিতেন না। কারাগারে তাঁহার ভুবনবিখ্যাত গ্রন্থ (Pilgrim's Progress) রচিত হইয়াছিল এবং সেই বেনিয়ানকে ইংরাজ মোজেসের (Moses) মত মান্য করিয়া আসিতেছেন। এতক্ষণ যাঁহাদের নাম করিলাম, শত চেষ্টা করিলেও তাঁহাদের মত একজন লোক তৈয়ার করিতে পারা যায় না। চেষ্টা করিলে কালিদাস, তরুদত্ত বা মাষ্টার মদনের মত হওয়া যায় না। মহাত্মা হোয়েটলীর (Archbishop Whately) জীবনী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, দৈবশক্তির দ্বারাই তিনি সিডিসের মত বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গণিত-শাস্ত্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেন ; তের বৎসরের সময় তাঁহার ঐ শক্তি লোপ পায়।



কাণ্টের দার্শনিক মত।

মহামতি কাণ্ট * পাশ্চাত্য-জগতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। ইউরোপে যে সকল দার্শনিক মতের প্রচার হইতেছে, তৎসমুদয়ই কাণ্টের দার্শনিক মতের আলোচনার ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার যুক্তি-খণ্ডনার্থ অপরের চেষ্টায় তাঁহারই মতাবলম্বীর সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা জানি যে, তিনি সর্ব্ব প্রথমে নীহারিকা-বাদের কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ-নিচয়ে প্রত্যেক কারণকেই তিনি অভাবপূরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা যে সকল পরিবর্ত্তন বা পরিণাম দেখিতে পাই, তাহার আবশ্যকতা আছে, স্বীকার করিতে হইবে। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দ্বিবিধ পরিণাম থাকাতেই, প্রকৃতিতে কখন প্রলয় হইতেছে ও কখনও জগৎ জন্মিতেছে। পরিণাম-স্বভাবা প্রকৃতির ও তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবর-

---

* ইম্যানুয়েল কাণ্ট ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে কনিকবর্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত স্থানেই ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

জঙ্গমাত্মক বস্তুর অনিবার্য্য পরিণামের কথা চিন্তা করাও সুকঠিন। তবে তাঁহার দ্বারা অব্যক্ত-শব্দিত মূলা প্রকৃতির ধর্ম্ম ও তাহার নিগূঢ় ভাব নিজ নিজ প্রজ্ঞা অনুসারে অল্পাধিক বুঝিতে পারা যায় মাত্র। হিউম এ কথা স্বীকার করেন না। কোনও পরিবর্ত্তন হইলে তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় রহিয়া যায়। গণিত-শাস্ত্রের মতে বিচার করিলে বুঝা যায় যে, সত্যতা অনুভবের উপর নির্ভর করে। আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহা পূর্ব্ব হইতেই আছে, প্রমাণস্বরূপ স্থান ও কাল। স্থান ও কাল পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের পরিচায়ক। সর্ব্বশক্তিমান্ আদিপুরুষ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি অনন্ত ও অবিনশ্বর, জ্ঞান-স্বরূপে সর্ব্বজীবের অন্তরে অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই সর্ব্বব্যাপী সত্য-স্বরূপ পুরুষ বুদ্ধি-বৃত্তিকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া থাকেন। মানবের ন্যায় নিকৃষ্ট জীবেরও পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। সুখ-দুঃখ-বোধ, ভয়, সন্দেহ, অপত্য-স্নেহ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য-সকল সর্ব্বসাধারণ। বিশেষতঃ, তির্য্যক জীবের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীস্থ জন্তুগণ মনুষ্যের ন্যায় স্মৃতি, অভিনিবেশ, কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা ব্যাপৃত হয় এবং কোন কার্য্য করিবার পূর্ব্বে অবস্থা-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কাণ্ট স্বীকার করেন যে, জীব-মাত্রেরই অহং (Practical Ego) এই অভিমান আছে এবং তাহার মূলে অপর এক ভাব সংলগ্ন আছে। তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও নিশ্চয়াত্মক। তাহা আমি ও আমি আছি, এই অবিচালাভাব। এ ভাব কেহ চেষ্টা করিয়া জন্মায় না, এবং তাহা কোনও প্রমাণের দ্বারাও অবধারণ করে না। এই খানে সাংখ্যদর্শনের সহিত ক্যাণ্টের মতের মিল আছে। এবং সেই জন্য পাতঞ্জলে "ঈশ্বর প্রণিধানাৎ স্থলে" বা শব্দের প্রয়োগ আছে (পা ১ সূ ২৩)। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারেরা আপন আপন মতের

পোষকতার জন্য সূত্রের অর্থান্তর করিয়াছেন। সূত্র যুগে দর্শন রচনা যে ভাবে হইয়াছিল, পৌরাণিক কালে সমন্বয়ের সময় তাহা রূপান্তরিত করিতে হইয়াছে। "সে জন্য কাণ্ট পদার্থের সপ্তদশ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

(১ম) কাল (Time) যাহা কালের ক্রিড়নক।

(২য়) স্থান (Space) যাহা কিছু না কিছু জুড়িয়া থাকে।

(৩য়) একত্ব (Unity) যাহার একত্ব আছে।

(৪র্থ) বহুত্ব (Plurality) যাহার বহুত্ব আছে।

(৫ম) পূর্ণত্ব (Allness) যাহার সর্ব্বব্যাপকতা আছে।

(৬ষ্ঠ) অস্তিত্ববাদ (Reality) জ্ঞানাতীত অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যাহা বিশ্বাসের ও সাধনার উপর অস্তিত্বযুক্ত।

(৭ম) নিরীশ্বরবাদ (Negation) ঈশ্বরের কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বের অতীতে ব্রহ্ম প্রতিভাসিত যে ক্রিয়া বস্তু তাহাই বোধ হয় উপলক্ষিত হইয়া থাকিবে। কেন না পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ তত্ত্ব যাহার হৃদয়ে উঠিয়াছে, তিনি ঈশ্বর অতীত প্রকৃতির ক্রিয়াকে পদার্থ বলিয়া কখনই স্বীকার করিবেন না।—বিশেষ জড়-প্রকৃতির যে পদার্থ-তত্ত্ব তাহা বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং কালাদির অধীন আর যাহা অতি প্রাকৃতিক (Supernatural) তাহা ষষ্ঠ সংজ্ঞায় বিবৃত হইয়াছে।

(৮ম) সীমা (Limitation) যাহার সীমা আছে।

(৯ম) পদার্থ (Substance) যাহাতে পদার্থত্ব আছে।

(১০ম) কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (Causality) এ সূত্রে আর অপদার্থ কিছুই থাকে না। যেমন প্রতিমা পূজার কারণ। পূজা মুক্তি বা পুণ্য-সঞ্চয়ের কারণ এতদুভয় পদার্থ। পুণ্যাদি ভক্তি ইত্যাদি বৃত্তির কারণ—অতএব এতদুভয় পদার্থ। ভক্তি যখন পদার্থ—তখন চিন্তন

স্মরণাদিও পদার্থ। অতএব মানবীয় তাবৎ বৃত্তিও পদার্থ আবার যাহা কার্য্য কারণ সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ বৃক্ষ-বীজের কারণ সেজন্য দুইটীই পদার্থ।

(১১শ) পারস্পরিক সম্বন্ধ (Reciprocity) অগ্নি ও জল পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, মানব ও মনে সম্বন্ধযুক্ত—সুতরাং এতদুভয়ে পদার্থ মন ও জীবাত্মা সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং এতদুভয় পদার্থ; জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং এতদুভয় পদার্থ এবং সম্বন্ধ যোগবাহিতা মানবে ঈশ্বর প্রতিভাসের সম্ভবতাই সাধিত হইয়া থাকে।

(১২শ) সম্ভাবনা (Possibility), যাহার সম্ভবতা আছে, তাহাও পদার্থ! গয়াধামে প্রেতকৃত্য করণ কালে যেমন সব, জানি না জানি, সকলেরই পিণ্ড দান করা হয়, কান্ট এখানে সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সমাজ—নীতি লইয়া, নীতি মনোবৃত্তিজাত; পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, মনোবৃত্তি পদার্থ, সুতরাং নীতি ও তজ্জাত সমাজ, পদার্থ। আমাদের হিন্দুসমাজও পদার্থ, এই সমাজে ভবিষ্যতে বিধবাবিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অতএব সেই সম্ভব্য বিধবাবিবাহও পদার্থ। বিবাহ ক্রিয়া পদ, পদার্থ বিশেষ্য, এ ব্যাকরণ দুষ্টতাই বা নষ্ট হয় কিরূপে? তবে আমাদিগের চিন্তা-শক্তির যতদূর দৌড়, তাহাতে বুঝিতে পারি, যে বস্তু হইতে যে বস্তুর উৎপত্তির সম্ভব থাকে, সেই সম্ভব্য বস্তুও পদার্থ। যেমন মেঘে বৃষ্টির সম্ভাবনা সুতরাং বৃষ্টিপূর্ব্ব যে মেঘ, তাহাতে যে সম্ভবাবৃষ্টি, তাহাও বস্তু; অর্থাৎ এক বস্তুতে ভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর অঙ্কুর থাকে, তাহাও বস্তু। (১৩শ) যথার্থ (Actuality) যে বস্তুতে যাথার্থতা বিদ্যমান, তাহার নাম বস্তু অর্থাৎ অশ্বডিম্ব, আকাশ-কুসুমাদিতে যাথার্থ না থাকায় উহা বস্তু নহে। তদন্যতর যাহা, তাহাই বস্তু। (১৪শ) অপরিহার্য্যতা (Necessity), যাহা পরিহার করিবার উপায় নাই, অর্থাৎ যাহা জীব জীবনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, তাহাই বস্তু।

বায়ু পরিহার করা যায় না, সুতরাং উহা বস্তু। (১৫শ) চিৎ (Soul), আত্মাও বস্তু, ইহা পূর্ব্বেও একবার বলা গিয়াছে। (১৬শ) প্রকৃতি (Universal) প্রকৃতি যে পদার্থ, তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। (১৭শ) ঈশ্বর (God) ঈশ্বরও বস্তু। ঈশ্বর ক্রিয়াময়, অতএব ক্রিয়া ও কর্ম্ম এতদুভয়ের সমবায়িতার নাম পদার্থ।" (দৈববাণী)

কাণ্টের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্জগদভিমুখী মতেরই প্রচার করিয়া বাহ্য জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ নির্ণয়েই কাল কাটাইয়াছেন। বাহ্য জগতের সৃষ্টি-প্রকরণ ও তাঁহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল। সেই সৃষ্টি কি উপায়ে অন্তর্জগতের অনুভূতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন। গ্রীসের দার্শনিকগণ এবং ইউরোপের নবজাত দার্শনিক-সম্প্রদায় বাহ্য জগতের মধ্যে অতীন্দ্রিয় কোন এক মহান্ চৈতন্য-শক্তিকে চিন্তার কেন্দ্র-বিন্দু মনে করিতেন। কিন্তু কাণ্ট সেই কেন্দ্রবিন্দুকে মানবাত্মার বা ইগোর (Ego) মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"বাহ্য জগতের সঠিক অবস্থা বুঝিবার সাধ্য মানুষের নাই, কারণ মানবের জ্ঞান ইন্দ্রিয়াধীন। মানবীয় তত্ত্বানুসন্ধানের কেন্দ্র-বিন্দু মানবের আত্মা, সেই আত্মা হইতে ইন্দ্রিয়পথে যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বাহ্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হয়। কপিল অন্তরের দিক হইতে জগত রচনার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে মহৎ তারপর—

১। মহৎ
|
২। অহঙ্কার
|
৩। বুদ্ধি
|
৪। মন
|

৫। দশ ইন্দ্রিয়
|
৬। পঞ্চ তন্মাত্র
|
৭। ক্ষিত্যাদি মহাভূত

মহাভূতের বিভিন্ন সন্নিবেশ হইতে জগত। এই খানেই কাণ্টের Category বাদের সহিত সামঞ্জস্য হইয়াছে, একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন যে "কাণ্ট" নিজে এই তত্ত্বকেন্দ্রের স্থান পরিবর্ত্তনকে কোপার্নিকাসের জাগতিক পৃথ্বি-কেন্দ্র হইতে সৌর-কেন্দ্রে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সেলিং হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কাল বস্তুবিজ্ঞানের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধান কেন্দ্রকে উল্টাইয়া দিয়া বাহ্য জগতের মধ্যে লইয়া গিয়াছে। তাহাতে বর্ত্তমানকালের পদার্থ বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকেরা অন্তর্জগতের তত্ত্ব-প্রকাশকগণের বিরুদ্ধে সেই পুরাতন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন





ফণোগ্রামের ইতিহাস।

"ফণোগ্রাম" ও "গ্রামোফোণ"—একই জিনিষের দুইটী নাম মাত্র। "ফণোগ্রাম" কথাটিকে ওলোট-পালোট করিয়া "গ্রামোফোণ" কথাটি সৃষ্টি করা হইয়াছে: (Phon-o-gram = Gram-o-phone)। "ফণোগ্রাম" ও "গ্রামোফোণ" যে কি সামগ্রী, আজিকালি তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দের নিদর্শন রাখা যায়, আর যে যন্ত্র গতিশীল হইলে পদার্থ-বিশেষের গাত্রে পরিচিহ্নিত শব্দের প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাকেই "গ্রামোফোণ" বলে। "ফণোগ্রাম" বা "ফণোগ্রাফও" তাহাই। যে উপায়ে ফণোগ্রাফ তৈয়ারী হয়, সেই উপায়ে গ্রামোফোণও তৈয়ারী হয়। মূল উপাদান উভয়েরই অভিন্ন।

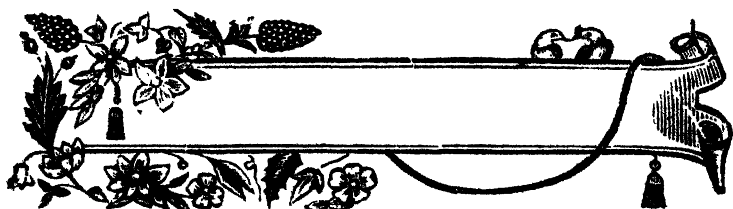
যে সমস্ত পদার্থ বা পুঞ্জ হইতে শব্দ নির্গত হয় (যেমন, টিউনিং ফর্ক, জালবৎ ত্বক, কাচনির্ম্মিত কি ধাতুবিশিষ্ট কোনও চক্র) তাহার চিহ্ন বা লক্ষণ অবগত হইবার জন্য বিজ্ঞানবিশারদগণ বহুকাল হইতে চেষ্টা করিতেছেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে টমাস ইয়ং চাকের উপর 'টিউনিং ফর্কের' স্পন্দন কিরূপে প্রতিঘাত হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ('ফর্ক' অর্থে কাঁটা, 'টিউনিং' অর্থে বাজা, টিউনিং ফর্ক

অর্থে—যে কাঁটা বাজে। বাঙ্গালাভাষায় 'টিউনিং ফর্কের' ঠিক প্রতি-শব্দ পাওয়া যায় না। যাঁহারা বাদ্যযন্ত্রের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা 'টিউনিং ফর্ক' কি তাহা বুঝেন।) ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্টহিম উক্তরূপ স্পন্দনের প্রতিঘাত-নির্ণয়ে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তারপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্কট জালের মত পাতলা চামড়ার উপরে শব্দের স্পন্দন আবিষ্কার করেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে স্কট কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল এক টুকরা পাতলা চামড়া ও সূক্ষ্ম একটী ফিকনা (লিভার) মাত্র ছিল। প্রথমে তিনি জালের মত চামড়াকে একটা চুঙ্গী বা ঢাকের উপর বিস্তীর্ণ করেন। তাহার পর ফিকনাটীকে সমান্তরালভাবে তাহার উপর দাঁড় করাইবার ব্যবস্থা হয়। 'স্ক্রু' বা পেঁচের সাহায্যে ফিকনাটি আবশ্যকানুরূপ দণ্ডায়মান থাকে। ইহার পর তারপিণ তৈল ও কর্পূরে অগ্নিসংযোগ করিয়া ধূম নির্গত করা হয়। তাহাতে চুঙ্গীর উপর বিস্তৃত চামড়ার গাত্রে কালী পড়ে। চুঙ্গীটী এরূপভাবে স্থাপিত করা হইয়াছিল যে, সেটী যখন ঘুরিতেছিল, তখন 'স্ক্রু' বা পেঁচটীকে গতিশীল চক্রবাড়ের মত দেখাইয়াছিল। চামড়ার গাত্রে যে কালী পড়িয়াছিল, তাহাতে "লিভারের" দ্বারা চামড়ার গায়ে একটি আঁকাবাঁকা রেখা অঙ্কিত হয়। (লিভার = ফিকনা, হুল বা যাহার দ্বারা চিহ্ন পড়িয়াছিল)।

ইহার পর দেখা যায়, শব্দের দ্বারা সূক্ষ্ম চামড়া স্পন্দিত হইলে, তদুপরি পূর্ব্বভাবে অবস্থিত লিভারটিও গতিশীল হয়। সূক্ষ্ম চামড়ার উপর যদি কর্পূর-তার্পিণ-সংযোগে প্রস্তুত শিখার কালী থাকে, তাহা হইলে লিভারের গতিবশতঃ চামড়ার উপর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁকাবাঁকা দাগ পড়িবে। স্পন্দনের চিহ্ন এইরূপে পাওয়া যায়। কোনিগ নামক একজন ফরাসী বিজ্ঞানবিৎ এই যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন।

তিনি এ বিষয়ে অনেক সারযুক্তি প্রদর্শন করেন। কোনিগের মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া বার্লো "লিভারের" অর্থাৎ চিহ্নকারীর উন্নতি সাধন করেন। তিনি যে যন্ত্র অবলম্বনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার নাম "লোগোগ্রাফ" (Logograph)। সে যন্ত্রে একটী একটী অক্ষর চিহ্নিত এবং সেই অক্ষরে এক বা একের অধিক অক্ষর সূচিত হইত। ইহার পর কনিগ অগ্নিশিখার স্থিতিস্থাপকত্ব প্রতিপন্ন করেন। পাতলা চামড়ায় ঢাকা একটী চৌবাচ্চার মধ্যে গ্যাস থাকিলে, এবং তাহার উপর শব্দ করিলে, সেই শব্দের ভারে পাতলা চামড়া স্পন্দিত হইবে, এবং তাহাতে চামড়ার উপর স্পন্দন প্রকটিত হইবে। হুইটষ্টোন সমভুজবিশিষ্ট ঘূর্ণায়মান দর্পণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্পন্দন যে ঐরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা সিদ্ধান্ত করেন। এ মতে শব্দের স্পন্দন অগ্নিশিখার দ্বারা বিজ্ঞানের গোচরীভূত হইয়াছে। তারপর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্লেক "লোগোগ্রাফের" পরিবর্ত্তে মানুষের কাণের পটহ ব্যবহার করেন। তাহাতে বিশেষ কোনও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই; কারণ, কৃত্রিম পটহ ও চক্রের দ্বারা যে চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা ভিন্ন মানুষের কর্ণের পটহের দ্বারা আর কিছু পাওয়া যায় নাই। সেই বৎসর ষ্টিন "টিউনিং ফর্কের" এবং বেহালার তারের স্পন্দনের "ফটো" তুলিয়াছিলেন। ইয়ংএর সময় হইতে গতিশীল পদার্থের উপরিভাগে বা গাত্রে শব্দের স্পন্দন আবিষ্কার উপলক্ষে অনেক চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু শব্দের যে প্রতিশব্দ উৎপাদন করা যাইতে পারে—এডিসনের পূর্ব্বে কেহই তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। তিনি ঐ সম্বন্ধে বিশেষ অধিকার-পত্র ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে পাইয়াছিলেন।





কাল নির্ণয়।

বৈদিক যুগের পণ্ডিতেরা যে নক্ষত্র-মণ্ডলীর সাহায্যে কাল নির্ণয় করিতেন তাহার নাম কালপুরুষ। ইংরাজী নাম অরায়ণ (Orion) ইংরাজী নামটী গ্রীক হইত সংগৃহীত। অরায়ণ যে অগ্রহায়ণের অপ-ভ্রংশ এবং অগ্রহায়ণ মাস হইতেই যে বৈদিক কালে বর্ষ গণনা হইত ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ আছে। কালপুরুষ নক্ষত্র মণ্ডলীতে আর্দ্রা বটৃভিব্ ও লুব্ধক চির পরিচিত। শেষোক্তটীর মত বৃহৎ ও উজ্জ্বল নক্ষত্র এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈশাখ মাসে উত্তর দিকে সপ্তর্ষি এবং দক্ষিণ দিকে কালপুরুষ সন্ধ্যার পরই দেখিতে পাওয়া যায়। এই নক্ষত্র মণ্ডলী মীন রাশির অন্তর্গত। বঙ্গদেশে ইহাকে "আদম-সুরৎ" বলিয়া থাকে। সাধারণ লোকেও অসংখ্য তারার মধ্য হইতে এই নক্ষত্র-মণ্ডলীকে চিনিতে পারে।

এ সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকিলে সুবিধা হয়। কারণ কল্য যে তারা দেখিয়াছি এখন যদি তাহা দৃষ্টি গোচর না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে স্থান পরিবর্ত্তণের জন্যই উহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু সেই নক্ষত্রটী যদি কোন চিহ্নিত নক্ষত্র-মণ্ডলীর অন্তর্গত হয় তাহা হইলে চিনিয়া লওয়া একটু সহজ হইবে। এই জন্য আমাদের

জ্যোতিষ শাস্ত্রে নক্ষত্র-মণ্ডলী চিহ্নিত করিয়া উহাদের এক একটী মূর্ত্তি কল্পনা ও নামকরণ করা হইয়াছিল” এই নাম ও আকার কল্পনায় দুইটী সুবিধা হইয়াছে। কোন দিন আকাশের কোনস্থানে সূর্য্য ও চন্দ্র অবস্থান করে তাহা নামের দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং সেই স্থান আকাশের কোন অংশে তাহাও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

জ্যোতিষ শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন যে চন্দ্র ২৭।২৮ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে বলিয়া জ্যোতিষিগণ চন্দ্রের পথকে ২৭ ভাগে বিভক্ত করেন এই সাতাইসটী বিভাগই দক্ষ রাজার ২৭টী কন্যা বলিয়া পুরাণে উক্ত হইয়াছে। নক্ষত্র গুলির নাম প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যা হইতে পরের পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্যান্ত ৩০ বার সূর্য্য দেবকে দেখিতে পাওয়া যায় নক্ষত্রচক্র ঘুরিতে তাঁহার যে সময় লাগে তাহার মধ্যে দ্বাদশবার পূর্ণিমা ও অমাবস্যা হয়। তাহাতেই ৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনের বৎসর স্থির করা হয় নক্ষত্রে মণ্ডলীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এমন কি মিশর দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ টলেমী ৪৮টী নক্ষত্র মণ্ডলীর কথা বলিয়া গিয়াছেন।

আমাদের এই মনে হয় এই যে গণনার জন্য কতকগুলি মাত্র নক্ষত্র মণ্ডলী কল্পনা করা আবশ্যক হইয়াছিল। চন্দ্রের গতি দেখিয়া চন্দ্রপথ যেমন ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল তেমনই সূর্য্য সেই পথে দ্বাদশ মাসে ভ্রমণ করে বলিয়া সেই পথকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা হয় অর্থাৎ অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র-মণ্ডলী ১২ ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক ভাগে ২।০ সোয়া দুই নক্ষত্র পড়িয়াছে এই সোয়া দুই নক্ষত্রই এক এক একটী রাশি, এই রাশিগুলি চক্রাকারে অবস্থিত বলিয়া

"রাশিচক্র" নাম পাওয়া যাইতেছে যে সময়ে দুই দুই রাশিতে এক এক ঋতু ধরা হইয়াছে তাহার অনেক পূর্ব্বে আহ্নিক-গতি অনুসারে উদয়াস্ত ধরার নিয়ম প্রত্যবেক্ষিত হইয়াছিল।

আমরা যে এখন সূর্য্যঘড়ী দেখিতে পাই, তাহা খৃষ্টের জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে চালডিয়া নিবাসী বরোসস নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ আবিষ্কার করেন, তারপর আরব দেশীয়েরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া আবুল হাসানের দ্বারা সম্পূর্নরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইউরোপ ও এসিয়ায় যে সকল সূর্য্যঘড়ী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা উপরোক্ত সুধীদ্বয়ের চেষ্টার নিদর্শন।

ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস বলেন যে গ্রীকেরা ব্যাবিলনের নিকট হইতে ডায়েল তৈয়ারী করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঘড়ীর মত যে ইহার আদর ছিল হুগলীর এমাম বাড়ীর সূর্য্য-ঘড়ী দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এদেশে এক সময়ে বালীর মাপে সময় জানিবার উপায় ছিল একথা অনেকেই জানেন। লীলাবতীর বিবাহের সময় যে উপায়ে সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তাহার কতক আভাস ইংরাজী পুস্তকে পাওয়া যায়।





আত্মহত্যা।

যে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া—শাস্ত্র পুনঃপুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, রাজবিধিতে যাহা ঘোর অপরাধ, এবং বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে 'ইন্‌স্যানিটি'—(উন্মাদের কার্য্য) বলিয়া থাকেন লোকে সে আত্মহত্যা করে কেন? সুখ-শান্তি না থাকিলে যে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও আশা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ আত্মহত্যা করে না,—সে পক্ষে সন্দেহ নাই। ডাক্তার মহাশয়েরা এই শ্রেণীর মৃত্যুকে ক্ষণিক বাতুলতা বা উন্মত্ততার ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু অনেক সময় তাহাও ঠিক বলিয়া মনে হয় না। অনেক দিন পূর্ব্বে কেহ কেহ উইল করিয়াছেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেশ বুদ্ধি ও বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। এই যে সেদিন পোর্ট আর্থার-বিজয়ী জাপানের মুখোজ্জলকারী জেনারেল নোগী আত্মহত্যা করিলেন, তাহা ক্ষণিক বাতুলতার দরুণ হইয়াছে বলিব? তিনি অনেক দিন হইতে ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং "উইল" পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার স্ত্রী যে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন, তাহাও কি "টেম্পরারি ইন্‌স্যানিটি" বলিতে হইবে?

আমরা সকল কথায় বলি—"মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থাঃ"। কিন্তু কোন্ সম্বন্ধে কোন্ মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ কর্ত্তব্য, তাহা নির্ণয় করাই সুকঠিন। কৃষ্ণ, রাম, চৈতন্য, যীশুখৃষ্ট প্রভৃতির জীবনেও এ সম্বন্ধে বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। লক্ষ্মণ-বর্জ্জনের পর শ্রীরামচন্দ্র সরযূতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সাগরের অনন্ত-ক্রোড়ে আশ্রয় লন। লাইকারগাস, ক্লাইভ প্রভৃতি অনেকের কথাই মনে হয়। কেহ কেহ বলেন যে যাহার দ্বারা জগতের যতটুকু কার্য্য হওয়া সম্ভব, ততটুকু কার্য্য হওয়ার পর তাহার আর থাকিবার আবশ্যক নাই। 'ষ্টোইক ফিলসফির' প্রতিষ্ঠাতা জীনো আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলেন নাই; বরং তিনি আত্মহত্যা করা কর্ত্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। যে সকল কারণে আত্মহত্যা করা উচিত, জীনো তাহা এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন;—(১ম) যেখানে আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার উপায় নাই। (২য়) দরিদ্রতা, ব্যাধি বা বৃদ্ধ বয়সের নানা কষ্ট হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে। (৩য়) যে স্থলে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার উপায় নাই। (৪র্থ) অন্যের উপকারার্থে।

জীনো যে-সে লোক ছিলেন না। তাঁহার মত পণ্ডিত ও অসাধারণ ত্যাগী পুরুষ জগতে দুর্লভ। আর সেনেকা—তিনিও এরূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন। শুধু তাঁহারাই বা কেন? এতৎপ্রসঙ্গে ক্লিয়ান্‌থিস, কেটো, ইরাটসথিনীস, বাগল, ফিটজয়র, তুরস্কের সুলতান আবদুল আজিজ, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি সেকালের ও একালের অনেকের নাম স্মরণ হয়। ইঁহারা সকলেই অসাধারণ প্রতিভান্বিত ছিলেন। কিন্তু প্রতিভান্বিত থাকিলেও, ইঁহাদের এবম্বিধ কার্য্য প্রমাদপূর্ণ বলিয়া মনে করিতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে, পুরাণে ইতিহাসে সেই প্রমাণই পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্বের সূচনায় দেখা

ভীষ্মের ইচ্ছা-মৃত্যুর কথাতে পাছে লোকের মনে সন্দেহ হয়, সে জন্য মহাভারত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—

"নাভিনন্দেত মরণং, নাভিনন্দেত জীবিতম।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥"

আমরা হিন্দু; এতদ্বাক্যই আমাদের শিরোধার্য্য। সুতরাং এতৎপ্রসঙ্গে আরও দুই এক কথার অবতারণা আবশ্যক মনে করি। তাহাতে, বর্ণিতব্য বিষয়ের ভাব উপলব্ধি হইলে, সংশয় দূরীভূত হইতে পারিবে।

ধর্ম্মের দুইটি দিক আছে। একটী দ্বারা বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ অনুভব করা যায়; অপরটির দ্বারা নিজের অস্তিত্বের সম্বন্ধ অনুভব করা যায়। হারবার্ট স্পেন্সার সেই দুইটী দিক্‌কে Material এবং Emotional বলিয়াছেন। কর্ম্ম-জীবনের শেষে দেহনাশ অবশ্যম্ভাবী। আবার কর্ম্মের শেষই মোক্ষ। আত্মহত্যা অর্থে সাধারণতঃ জ্ঞানযোগ অভ্যাস না করা বুঝায়। কিন্তু যাঁহারা ভীষ্মের মত চলিয়া যান, তাঁহাদের মৃত্যু—আত্মহত্যা নয়, তাঁহাদের দেহনাশেই মোক্ষলাভ। আমি নারীসুলভ অভিমানের আত্মহত্যার কথা বলি নাই। বলিলেও দোষ হইত না। চিতোরের রাজপুত-রমণীগণ চিতা প্রজ্বলিত করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিলে কি তাঁহাদের চরিত্রে কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করা হয়? না, তাঁহাদের দেহের অবসানের সহিত তাঁহাদের চরিত্রের উজ্জ্বলতা প্রতিপন্ন করা হয়? শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির যে আত্মত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা সুদুর্লভ, তাহা গৌরবের মহিমায় মণ্ডিত। জীবের বাঁচিবার এক অহেতুকী ইচ্ছা থাকে। পশুতে সেই ইচ্ছার প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়; এই কারণেই পশুরা নিয়তই ভয়ের বশবর্ত্তী। কিন্তু প্রয়োজন হইলে যিনি সেই ইচ্ছাকে জয় করিতে

পারেন, তিনি অবশ্যই মুক্ত। যে ভাব প্রাপ্ত হইলে যোগিগণ পুনরায় সংসারে আবর্ত্তন করেন না, শ্রীচৈতন্য সেইভাবে বিভোর হইয়াছিলেন এবং স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন। তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থে ভগবানের রূপ দর্শন করিয়াছিলেন সুতরাং তিনি বারিনিধি-বক্ষে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া প্রত্যক্ষগোরীভূত আনন্দের সমাবেশ দেখাইয়াছিলেন বলিলেও দোষ হয় না। যিনি অন্তর্বাহ্যে ব্রহ্মদর্শন করিয়াছেন তাঁহার নিকট বারিনিধি-বক্ষই বা কি আর শৈলমালাই বা কি—সকলই সমান। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে পুঁথিপত্র যাহা আছে, তাহা তাঁহার শিষ্যের: বা শিষ্যের শিষ্যেরা লিখিয়াছেন। শিষ্য, গুরুর কথা লিখিতে গেলে একটু বাড়াইয়া লিখিবে—এ কথা মনে করা যাইতে পারে। তবে চরিত্রের উৎকর্ষ না হইলে, বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছাকে জয় করা যায় না,—এ কথা নিশ্চিত। লোকের রুচি উৎপাদনার্থ নানা স্থানে নানা কথা লিখিত আছে।





আমিষ ভোজী ও নিরামিষ ভোজী।

আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে যে অংশ বিশেষ পুষ্টিকর তাহাকে ইংরাজীতে gluten বা albumen বলে, এই অংশ মাংসে যত পাওয়া যায়, তাহার অনেক বেশী ফল-মূলে পাওয়া যায়। Sir H. E. Roscoe পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন যে, মাংসে শতকরা ২৫ ভাগ পুষ্টিকর সামগ্রী আছে কিন্তু চাউল, মটর, গম ইত্যাদিতে শতকরা ৮২ ভাগ পর্যান্ত পুষ্টিকর সামগ্রী আছে।

"এ কথা যদি সত্য হয়, তবে বলাধানের নিমিত্ত মাংস ব্যবহার আবশ্যক নাই একবার ডাক্তার ফার্ব্ব সাহেব কতকগুলি ইংরেজ, স্কচ ও আইরিস যুবা একত্রিত করিয়া পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। যুবকেরা সকলেই সমবয়স্ক। তাহাদের মধ্যে আইরিস যুবকগণ দৈর্ঘ্যে, গুরুত্বে এবং শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। ঐ আইরিস যুবারা গোল আলু ভিন্ন কখন মাংস খায় নাই। "পৃথিবীতে যত বলিষ্ঠ লোক দেখিবে নিরামিষভোজী তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান" F. R. Lees, M. D. "On the Primitive Diet of Man"

যাঁহাদের কীর্ত্তি অদ্যাপি ইউরোপে ঘোষিত হইয়া থাকে তাঁহারা নিরামিষ ভোজী ছিলেন। থারমাপিলির যোদ্ধারা কখন মাংস আহার করেন নাই। মিসর জাতিরা ফল মূল আহার করিতেন, তাঁহারাও বল

বিক্রমের পরিচয় দিয়াছেন ; আর্য্যেরা মাংসাশী ছিলেন না ? "বর্ত্তমান কালের কথা স্বতন্ত্র, এক্ষণে যাঁহারা বিলাতে বিখ্যাত, কেবল অস্ত্রবল তাঁহাদের বল ! ল্যাপল্যাণ্ডের লোকেরা মাংস আহার করে, তাহারা দুর্ব্বল এবং ঘৃণিত কিন্তু তাহাদের দেশে ফিনস্ নামে আর এক জাতি বাস করে, উহারা মাংস খায় না, ল্যাপল্যাণ্ডারদের অপেক্ষা তাহারা বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘকায়। নরওয়ের লোকেরা নিরামিষ ভোজী অথচ তাহারা বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী।" (ভ্রমর)

আমাদের দেশে আশানন্দ ঢেকী বা রামদাস বাবুর মত বিখ্যাত বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা মাংস আহার করিতেন না বলিলেও ব্যক্তি বিশেষের উদাহরণ হয় বটে কিন্তু উচ্চ বর্ণের বিধবারা নিরামিষ ভোজী এবং সধবাদের অপেক্ষা দৈহিক শক্তিতে হীন নহে বলিলে কোন দোষ হয় না। সে কথা সকলেই স্বীকার করে।

জর্ম্মণদের মধ্যেও অনেক নিরামিষ ভোজী আছে তাহারা বুঝিয়াছে যে নিরামিষ ভোজনে ধর্ম্মভাব, স্মৃতি, মেধা বৃদ্ধি পায় এবং চরিত্রের উৎকর্ষ হয়। এ সকল প্রমাণ সত্ত্বেও লণ্ডনের কসাইখানা সমূহ হইতে প্রতি সপ্তাহে সাড়ে চারি হাজার মণ হাড় ও চর্ব্বি রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। কত প্রাণী নিহত হইলে প্রতি সপ্তাহে সাড়ে চারি হাজার মণ হাড় ও চর্ব্বি সংগৃহীত হয় তাহা পাঠক অনুমান করিয়া লউন। কিন্তু যাহারা যুদ্ধাধিকার্য্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের সকলেরই দেশের অবস্থা এইরূপ।





ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম।

যমুনা, সরস্বতীর সহিত গঙ্গার মিলন ও বিয়োগ স্থানই ত্রিবেণী। ভরদ্বাজাশ্রম বা এলাহাবাদের প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীত্রয় এক হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, সে জন্য ঐ ত্রিবেণী যুক্ত-ত্রিবেণী। আর সপ্তগ্রামের নিকট হইতে উপরি উক্ত নদীত্রয়ের মধ্যে গঙ্গা সহস্রমুখী হইয়া সাগরের সহিত পৃথক্ পৃথক্ পথে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বলিয়া হুগলী জেলার ত্রিবেণী মুক্ত-ত্রিবেণী নামে অভিহিত হইয়াছে। বার্বাকাবাদের অন্তর্গত কাঞ্চীহাটা নামক স্থানে গঙ্গা দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। এক অংশ পূর্ব্বদিকে গিয়া চট্টগ্রামের নিকট সাগরে মিশিয়াছে। এখানে গঙ্গার নাম হইয়াছে পদ্মাবতী। অপরাংশ দক্ষিণদিকে গিয়া আবার তিন অংশে বিভক্ত হইয়াছে এবং গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নামে খ্যাত হইয়াছে। সবগুলিই সমুদ্রে পড়িয়াছে। এখানে ত্রিবেণী বলিলে হুগলী জেলার মুক্ত-ত্রিবেণীকেই সাধারণতঃ বুঝায়।

ত্রিবেণীর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। হিন্দু ও মুসলমানের প্রাচীন কীর্ত্তি এখানে প্রচুর আছে। ত্রিবেণীর ঘাটের উত্তরে বেহুলা উপাখ্যানের নেতা (নৃত্যকালী) ধোপানীর পাট। বেহুলা কলাগাছের ভেলায় পতিকে লইয়া এই স্থানে আসিয়া নেতার সাহায্যে দেবগণকে সম্প্রীত করিয়াছিলেন। এখানে একখানি পাথর আছে, তাহাকে স্থানীয় লোকেরা "নেতার পাট" বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত নেতার পাট যে কোন্ খানে, তাহা আজ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। চাঁদ সওদাগরের বাসস্থান যে কোথায় ছিল, তাহাও কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। এমন কি তমলুকের রাজার বাড়ীর নিকটে যে "খাটপুকুর" আছে তাহার পাড়েও একখানি পাথর আছে। ধোপারা "নেতার পাট" বলিয়া তাহার পূজা করে। ত্রিবেণী ঘাটের দক্ষিণে সরস্বতী পশ্চিমবাহিনী; পূর্ব্বদিকে যমুনা ও অপর পারে "ঘোষপাড়া"। পশ্চিমে কয়েক শত হস্ত দূরে শ্রীশ্রীবেণীমাধব জীউর মন্দির। এখানে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে "উত্তরায়ন্তি" নামে একটি মেলা হয় এবং ঐ দিন গঙ্গা স্নান উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। ত্রিবেণীর সান্নিধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামেও অনেক হিন্দু দেব দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি এবং মুসলমানদের উপাসনাস্থল ও কবরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জাফর খাঁ গাজীর যে "মাজার" আছে, তাহা এক সময়ে হিন্দু দেবালয় ছিল। এই মাজারের নাম "গাজী সাহেবের আস্তানা।" দেওয়ালে দুই খণ্ড বক্র লৌহ আছে; তাহা নাড়া যায় বটে কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা স্থানচ্যুত করিতে পারেন নাই, সেই জন্য বোধ হয় শুনা যায়, "জাফরা গাজীর কুড়ুল নড়ে চড়ে পড়ে না।" যে দুইটি কুঠারী এখন আছে তাহার ছাদ নাই। উহার মেঝে কাল পাথরের।

ত্রিবেণী হইতে মহানাদ পর্য্যন্ত বাঁধের উপর যে রাস্তার ভগ্নাবশেষ এখন দেখিতে পাওয়া যায় উহাই "জামাই জাঙ্গাল"। ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা হরিচন্দন দেব ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর ঘাট ও জামাই জাঙ্গাল অদ্যাপি তাহা ঘোষণা করিতেছে।

ত্রিবেণীর সান্নিধ্যে বটগেড়ে নামক যে পুষ্করিণী আছে তাহার জলকর প্রায় ২৫০০ আড়াই হাজার বিঘা। এক্ষণে যদিও চটান হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এতবড় পুষ্করিণী আর কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই।

ত্রিবেণীর দুই মাইল পশ্চিমে সরস্বতীর উপরে সপ্তগ্রাম। কান্যকুব্জের রাজা প্রাশ্নবন্তের সাত পুত্র (অগ্নিধ্র, রোমনক, ভোপিশন্ত, সৌরবনন, বর, সরন, দ্যুতিমন্ত) এইখানে বাস করিতেন। এই সপ্তজন মহাত্মা ঋষি ছিলেন। বিপ্রদাসের কবিতাতে তাঁহাদের ও সপ্তগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগরের জলযাত্রা উপলক্ষে বিপ্রদাস যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বুহিত্র চাপয্যাকুলে চাঁদ অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্ত রিসি স্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ সর্ব্ব গুণধাম॥
জ্যোতি হৈয়া এক মুর্ত্তি রিসিমুনি সেবে তথি
জপ তপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিসাল অতি
অধিষ্ঠানে উমা মহেশ্বর॥
দেখিয়া ত্রিবেণি গঙ্গা চাঁদ রাজা মনে রঙ্গা
কুলেতে চাপায়ে মধুকর।

আনন্দিত মহারাজ করে নৃপতি তির্থি কাষ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর ॥
তির্থি কার্য্য সমাপীয়া অন্তরে হরি (ষ) হয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।
ছত্রিশ আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দ বঞ্চয়ে নিরন্তর ॥

বাণিজ্যের জন্য সপ্তগ্রাম ইউরোপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। সিরাজের সময় হইতে তাহার অপর নাম "গ্যাঞ্জেস রেজিয়া" হইয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে সৌধমালার ভগ্ন স্তূপ সকল তাহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে, সরস্বতীর উপকূলে পুরাতন দুর্গের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দুর্গ যে সুদৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। উহার উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্ব সরস্বতীর দ্বারা রক্ষিত এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল, তাহারও স্থানে স্থানে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

১২০৫ সালে যখন বঙ্গের গৌরবরবি অস্তাচলশায়ী হন, তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলমানেরা বঙ্গদেশকে উনবিংশ খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিল। তাহাদেরই আমলে সপ্তগ্রাম 'সরকার' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, মুরশীদাবাদ, এবং ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্ত্তী হাতীয়াগড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন বেতাকীর খাল দিয়া বণিকেরা সপ্তগ্রামে গমনাগমন করিতেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ঐখানে এমন চড়া পড়িয়া যায় যে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহারা ঐ পথ ত্যাগ করিয়া ভাগীরথী দিয়া সপ্তগ্রামে যাইতেন।

ত্রিবেণীর অপর পার্শ্বে যে দ্বীপ আছে, তাহা ইং ১৫৪০ সালে এই ভাবেই ছিল, তাহার প্রমাণ আছে (De Barros)। সরস্বতীতে

পুরাতন বাঁধের চিহ্ন এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। নদীগর্ভ ভরাট হওয়ায় এবং পর্টুগীজেরা হুগলীতে বন্দর স্থাপন করায় সপ্তগ্রামের অবনতি আরম্ভ হয়। সে সময়ে হুগলীর নাম "গোলা" ছিল পর্টুগীজেরা যে ঠিক কোন্ সময়ে এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিয়াছিল, তাহা মার্শম্যান, হাণ্টার প্রভৃতি কোন ইতিহাসবেত্তা বলিতে পারেন নাই। তবে ১৫৩৭ সালে শেরসা মামুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইলে তিনি মালাবারের পর্টুগীজ শাসনকর্ত্তার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন (Abul Fazl) নৌ-সেনাপতি সম্প্রদায় সেই উপলক্ষে নয়খানি জাহাজ লইয়া গঙ্গায় আসিয়াছিলেন (Riyazu S. Salutin) সপ্তগ্রামে শতবর্ষ বাস করিবার পর ষোড়শ শতাব্দীর শেষে পর্টুগীজেরা চট্টগ্রামে আর একটি বন্দর স্থাপন করে। তদানীন্তন অধ্যক্ষ গনজালীস এক হাজার ইউরোপীয় ও দুই হাজার স্থানীয় লোকের সাহায্যে চট্টগ্রামের চতুর্দ্দিকে পর্টুগীজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এতই প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে তাঁহাকে সংযত করিবার জন্য ঢাকাতে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, মুসলমান শাসনকর্ত্তারা সে সময়ে দেবকোটে (দিনাজপুরে) লক্ষ্মণাবতীতে ও সোনারগাঁয়ে বাস করিতেন। তাঁহাদের নিকট আকবরের সময় হইতে সপ্তগ্রামের নাম হইয়াছিল "বলঘাক-খানা" বা বিদ্রোহীর আড্ডা। সে সময়ে সপ্তগ্রাম উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামের পতন আরম্ভ হয়। তৎপরে ১৬২৪ সালে সাজেহান মহাবেতের নিকট পরাস্ত হইয়া মসলীপটন হইতে বাঙ্গালায় আসেন এবং পর্টুগীজদের অধ্যক্ষ মাইকেল্ রডারিগসের সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু রডা-রিগস্ তাহাকে সাহায্য করেন নাই। সেই অবধি সাজেহানের হৃদয়ে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জলিত হয়।

তিনি ১৬৩২ সালে হুগলী অধিকার করেন। ইহাতে পর্টুগীজ-পক্ষে এক হাজার লোক হত ও চারি হাজার লোক বন্দী হইয়াছিল। বন্দী-গণের মধ্যে পুরোহিতগণকে দরবারে ও রূপসী স্ত্রীলোকদিগকে বাদসাহের "সেরাগ্লীয়ো" বা উপস্ত্রীর আলয়ে প্রেরণ করা হইয়াছিল। মুসলমানেরা প্রায় তিন শত জলযান অধিকার করিয়াছিল। দরাফ্ খাঁয়ের গঙ্গাস্তোত্র এই সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং এই সময় হইতেই হুগলী রাজকীয় বন্দর হইয়াছিল।

সাতগাঁয়ের লোকেরা যে এক সময়ে সকল বিষয়ে উন্নত হইয়াছিল, তাহা "সাতগাঁয়ের কাছে মামদোবাজী" কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে,—

"Its importance as a place of trade and shipping is well attested and even as a modern Bengalee proverb uses the term Satgaonman in the sense of an astute fellow."

(Hunter)

ইংরাজী ১৭২৮ সালেই সপ্তগ্রামে ২,৯৭,৯৪১ ্টাকা খাজনা আদায় হইয়াছিল।

এক্ষণে সপ্তগ্রাম একেবারে জনশূন্য হইয়াছে। এখন সপ্তগ্রাম বলিলে ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের নিকট দশ বার খানি পর্ণকুটীর বুঝাইয়া থাকে। প্রাচীনত্বের চিহ্ন-স্বরূপ উদ্ধারণ দত্তের উপাসনাস্থল ও সৈয়দ ফকরুদ্দীনের মসজিদ এবং কয়েকটি সমাধি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে সপ্তগ্রাম এক সময়ে কমলার আবাসভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইত, কালের কুটিল গতিতে আজ তাহাই মরুভূমি। যে রাজবর্ত্মের জনতা ভেদ করা যাইত না, তাহাই আজ জনশূন্য। যে সকল প্রাসাদ নদীতটে দণ্ডায়মান ছিল, আজ তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত।



সিংটী শিবপুর।

হাওড়া-জেলার অন্তর্গত সিংটী ও শিবপুর দুইটী গ্রাম হইলেও, বহুকাল হইতে যুক্ত-নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। হাওড়া যখন শ্বাপদ-সঙ্কুল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে সিংটী-শিবপুর একটী সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। * হাণ্টার বলেন,—"১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে হাওড়ার জমিদার লভেট সাহেব রেভিনিউ বোর্ডে দরখাস্ত করেন যে, তাঁহাকে যেন হাওড়া পরিত্যাগ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়।" ইহার পূর্ব্বে হাওড়ার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ঘটনার এক শত বৎসর পূর্ব্বে রেনেল সাহেব তাঁহার মানচিত্রে সিংটী-শিবপুরের

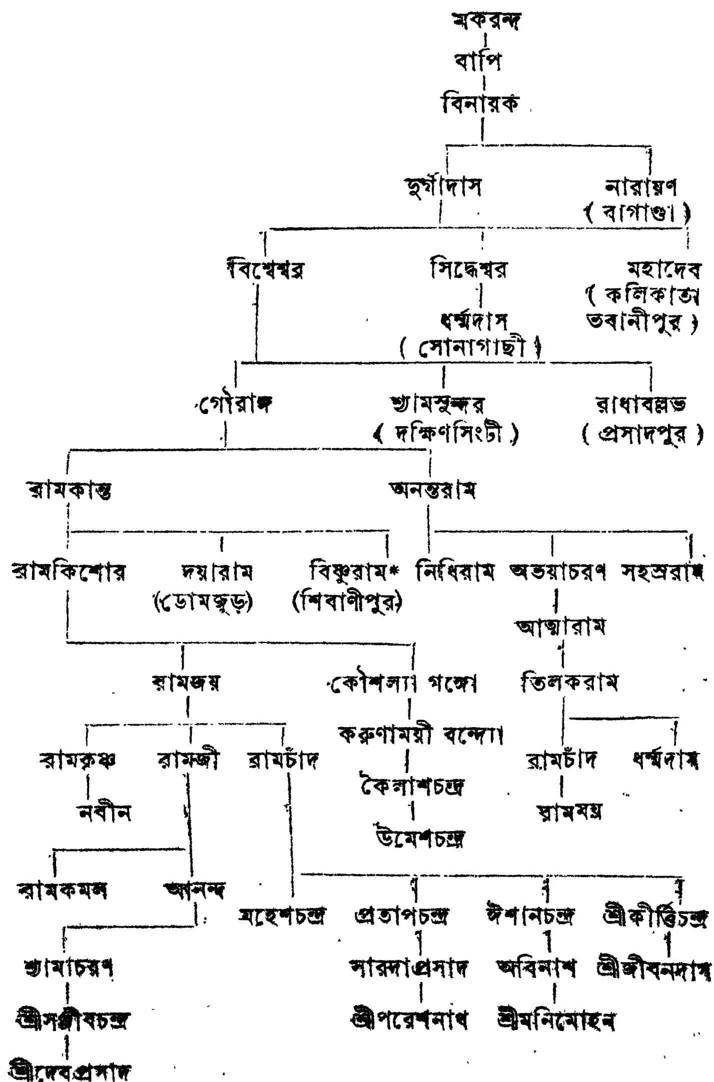
* "In 1750 Howrah is said to have been a line of mud banks reeking with malaria, corpses in all stages of decomposition floating up and down the stream by the dozen, jungle lining the shore the abo de of the snake and alligator."

Howrah Past and Present.

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ‘ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটীয়ারে’ সিংটী-শিবপুর সম্বন্ধে লিখিত আছে,—“Singti and Shibpur are old places on the bank of the Kana Damoder and shown in Rennell's Atlas, Plate VII.”

আকবরের রাজত্বকালের অন্যূন ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, চাতরার (শ্রীরামপুর) দেশ-গুরু ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বংশসম্ভূত ‘শিউঠাকুর’ বা শিবচন্দ্র নামক এক সন্ন্যাসীর পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সন্ন্যাসী হইতেই গ্রামের (শিবপুর) নামকরণ হয়। মকরন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ, শিউ ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। সন্ন্যাসী প্রত্যহ দ্বাদশটী নারায়ণের পূজা ও ভোগ দিতেন। তিনি সেই নারায়ণ একটী মকরন্দকে দিয়াছিলেন, সেই নারায়ণ রাজরাজেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া এখন পর্য্যন্ত মকরন্দের বংশানুক্রমে পূজিত হইতেছেন। মকরন্দের বংশানুচরিতে (হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে) এই সমস্ত কথা পাওয়া গিয়াছে। কেশবমল্ল সিংহের আমলে (ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে) শিবপুরের কতকাংশ সিংহবাটী বা সিংটী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম ও বাঁকুড়া-রায়-ধর্ম্ম সিংটী-শিবপুরের দুইটী প্রসিদ্ধ বিগ্রহ। কেশবমল্লের সময়ে গ্রাম বিভক্ত হইলে, সনাতন-ধর্ম্ম—বাটীতে ও বাঁকুড়া-রায়-ধর্ম্ম শিবপুরে পড়ে।

মকরন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামের আদি ব্রাহ্মণ-অধিবাসী। তাঁহার বংশে অনেক খ্যাতনামা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় গ্রামের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহাদের কীর্ত্তি অদ্যাপি ঘোষিত হইতেছে। অনন্তরাম, রামজয়েশ্বর, রত্নেশ্বর প্রভৃতি শিবমন্দির-সমূহ তাঁহারাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নিম্নে মকরন্দের বংশলতা দেওয়া গেল ;—



* শ্রীবৃন্দাবনধামের শ্রীমৎ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী ইঁহারই বংশ-সম্ভূত।

মকরন্দের বংশধরেরাই এই গ্রামের বিশেষ উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিনায়ক, অনন্তরাম, রামজয়, রামজী, ধর্ম্মদাস প্রভৃতির কীর্ত্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। স্থানীয় স্কুলটী এই বংশের মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রথমে বাড়ীতে স্থাপিত হয়। পরে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কীর্ত্তিচন্দ্রের চেষ্টায় ঐ স্কুল গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে মহেশচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ত্তৃত্বাধীনে স্কুলের অবস্থা ভাল হয়। উমেশচন্দ্র স্কুলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে স্কুলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। মন্দিরগুলি মেরামতের অভাবে বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যেই পড়িয়া যাইবে। পুষ্করিণীগুলিও বহুকাল পঙ্কোদ্ধারের অভাবে অব্যবহার্য্য হইতেছে।

সপ্তগ্রাম যখন বাঙ্গালার বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল, খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান যখন বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধি-সম্পন্ন, সিংটী-শিবপুর সেই সময়ে বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এক নদীর গতি-পরিবর্ত্তন জন্যই গ্রামের দুরবস্থা হইয়াছে। গ্রামের পূর্ব্বদিকে যে নদী আছে, উহাই আদি-দামোদর। এখন উহার নাম—কাণা নদী। ঐ নদী এক্ষণে বহতা না থাকায় এবং জলপ্রবাহ-বিতাড়িত পলি ও বালীতে নদীগর্ভ পূর্ণ হওয়ায়, গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে; আর ম্যালেরিয়ার জন্য লোকের যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইয়াছে। মকরন্দের বংশধর ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং গ্রামের অন্য ভদ্রলোকদের চেষ্টায় গ্রামে যে "ডিউক-দাতব্য-ঔষধালয়" স্থাপিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাও উঠিয়া গিয়াছে।

রামকিশোরের সময়ে এই গ্রামে চতুর্ভুজ গঙ্গোপাধ্যায় নামে আর একজন মহাপুরুষ বাস করিতেন। তিনি দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক ছিলেন।

তারকেশ্বর তীর্থের আবিষ্কার-কালে যে চতুর্ভুজ তারকেশ্বরে পৌরহিত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনিও এই বংশের। তিনি ভারমল্লের নিকট হইতে ভূসম্পত্তি পাইয়া ভঞ্জপুরে বাস করেন।* গাঙ্গুলী মহাশয়েরা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা যে কে কোন্ সময়ে বাস করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। গাঙ্গুলী-বংশের গোপীকান্ত, ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে বিবাহ করিয়া অনেক জমি পাইয়াছিলেন। এই গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমানাধিপতির ও রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের প্রদত্ত জমি এখনও পর্য্যন্ত ভোগ-দখল করিতেছেন।

কেশবমল্লের অনেক পূর্ব্বে এই গ্রামে অনেক কৈবর্ত্তের বাস ছিল। মণ্ডল, পাঁজা ও খাঁ বংশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল; তাহাদের এক-জন ব্রাহ্মণ জয়চণ্ডী দেবীকে স্থাপনা করেন। যে সময়ে বাঁকুড়া-রায়ের পূজা আরম্ভ হইয়াছিল, সে সময়ে গ্রামে বড়ই বাঘের উপদ্রব ছিল; হিংস্রজন্তু বিশেষতঃ ব্যাঘ্রকে শান্ত করিবার জন্যই বাঁকুড়া-রায়, কালু-রায় ও দক্ষিণা-রায়ের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল।† যে কারণেই হউক, আড়া-ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া-রায় এবং বর্দ্ধমানাধিপতি (সম্ভবতঃ রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র), উভয়ে, সনাতন-ধর্ম্ম, বাঁকুড়া-রায়-ধর্ম্ম ও জয়চণ্ডীর পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত জমীতে এখনও দেবসেবার কার্য্য চলিতেছে। এই রাজা বাঁকুড়া-রায়ের নিকট সাহায্য পাইয়াই চণ্ডী-রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম দামুন্যার সিংহ

---

* শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বসু মহাশয় ১৩১৩ সালের ফাল্গুনের 'সাহিত্য-সংবাদে' 'তারকেশ্বর তীর্থ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে দুই চতুর্ভুজের উল্লেখ নাই।

† Some of the Godlings are invoked to protect their votaries against wild animals—the Gods of tigers are Dakhin Rai, Kalu Rai and Bankura Rai.—O' Malley and Chakrabarti.

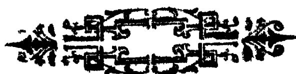
বাহিনী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। মৃত গ্রামবাসীগণের মধ্যে তারাচাঁদ ভট্টাচার্য্য, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অম্বিকাচরণ চৌধুরী, রমানাথ খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সিংটী-শিবপুরের উত্তরে ও পশ্চিমে—উদয়নারায়ণপুর ও বিনোদ-বাটী; আদি-দামোদরের একটী শাখা ঐ দুই গ্রামের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পান-শিউলীর মধ্য দিয়া রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেখানে ডেবুয়াখালী নাম হইয়াছে। এই ডেবুয়াখালীর পূর্ব্বপারে চিংড়ে ও পশ্চিমপারে রণজিৎ-বাটীর মধ্যে—"মুণ্ডেশ্বরী-দহ"। কিন্তু পুরাতন দলীলে ও গবর্ণমেণ্টের জরীপে আদি-দামোদরের ও ডেবুয়াখালীর কতকাংশকে গুস্‌করা বলা হইয়াছে। সিংটী-নিবাসী ৺বিশ্বনাথ চৌধুরী মহাশয়ের পৌত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ চৌধুরীর নিকটে একখানি দলীল ও পুরাতন মানচিত্র আছে। তাহাতে এই সকল বুঝিতে পারা যায়। স্থানীয় লোকেরা ঐ নদীকে এখনও আদি-দামোদর বলিয়া থাকে। এই নদী গড়ভবানী-পুর হইয়া কুলটিকরী ও সুন্দরমনে 'বিষখালী' বা বড়নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দেভুরস্থুট ও বিনগাঁর মধ্যে যে "হানা" পড়ে, তাহাই বিষখালী নামে অভিহিত। এ অঞ্চলের লোকেরা ইহাকে "বড়নদীও" বলিয়া থাকে। 'বিষখালী'—সেনপুর, আকনা ও মহীশ-রাখা হইয়া উলুবেড়িয়া হইতে আট ক্রোশ দূরে শ্যামপুরের দক্ষিণে রূপনারায়ণের সহিত মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে রসপুরে যে মনসাদেবী আছেন, তাহার অপর পারে হানধাড়া বা সুন্দরমন। এখানে নদীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। যে স্থান পূর্ব্বে নদীগর্ভে নিহিত ছিল, সেইস্থানে এখন একখানি দোকান হইয়াছে। এই দোকান যে সুন্দরমনের উপরে হইয়াছে, তাহা এক পোয়া পথ অতিক্রম করিয়া কুলটিকরী বা রঘুনাথ-

পুর পৌঁছিলে বুঝিতে পারা যায়। শিবানীপুর ও রাজাপুরের মধ্যে কেরালের ঘাট ও বিখ্যাত শ্মশান। এইখান হইতে কেরালখালী নামে আর একটী শাখাও উপরোক্ত রঘুনাথপুরে আদি-দামোদরের সহিত মিলিত হইয়াছে। দেভুরসুট হইতে এক মাইল, সুন্দরমন হইতে এক পোয়া ও বিনোদবাটী হইতে গজা পর্য্যন্ত পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া দিলে আবার গ্রামসমূহের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাতে কোলা, ঘাটাল ও অন্যান্য স্থানেও যাইবার সুবিধা হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় এদিকে কাহারও আদৌ দৃষ্টি নাই।

সিংটী-শিবপুরে পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন হইতে ১লা মাঘ পর্য্যন্ত ত্রিবেণীর মেলার মত একটী মেলা হয়। তাহাকে "পীরপুকুরের যাত" বা "ভাই খাঁয়ের যাত" বলে। ইংরাজী ১৬৮৬ সাল হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে জবচার্ণকের অধীনস্থ ইংরাজগণ সায়েস্তা খাঁর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নিভৃত স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারই-স্মরণার্থ ঐ মেলার সৃষ্টি। সিংটী-শিবপুর এক্ষণে প্রাচীনত্বের চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত—বন-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। অশ্বথ-বটের অভাব নাই। গ্রামের প্রতি কর্ত্তাদের লক্ষ্য না থাকাতেই এইরূপ হইয়াছে। স্থানে স্থানে ছায়াময়ীর কথা স্মরণ হয়,—

নিবিড় অরণ্য যথা মারুত নিঃশ্বনে—
পত্র ঝর ঝর স্বরে, সর্ব্বদিক পূর্ণ করে,
তেমতি অস্ফুট নাদ, ঘন স্বর সবিষাদ, ইত্যাদি।



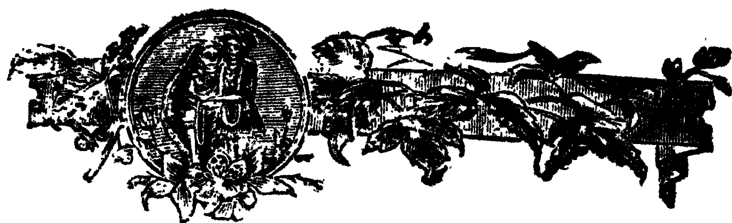


রাণীহংসপুর।

ভুবনেশ্বর হইতে নীলাচল অভিমুখে বনের মধ্য দিয়া দুই ক্রোশ অতিক্রম করিলে যে পর্ব্বত পুঞ্জের পাদমূলে উপস্থিত হওয়া যায় উহাই "খণ্ডগিরি"। এই গিরি দুই ভাগে বিভক্ত। উদয়গিরি ও অস্তগিরি। পর্ব্বত বক্ষে খোদিত গৃহ অলিন্দ ও স্তম্ভগুলি দেখিলে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়। এখানে পর্ব্বত খুদিয়া যে দ্বিতল বাটী হইয়াছে তাহারই নাম "রাণীহংসপুর।" এই বাটী প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে অশোকের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্ল্যান আজকালকার মত হইলেও থামগুলি আজকালকার মত নহে। এই বাটীর চিত্রাবলী দেখিলে পূর্ব্বকালের পরিচ্ছদ ও বেশভূষার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষের মালকোঁচা ও তাহার উপর কোমরে আর একখানি বস্ত্রখণ্ড বাঁধা আছে, তাহার অগ্রভাগ কোঁচার মত ঝুলিতেছে। গায়ে কাপড় নাই, মস্তকে দীর্ঘকেশ বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ, মুখে শ্মশ্রু বা গুম্ফ নাই, গলায় হার, হস্তে বলয়, কর্ণে কুণ্ডল, স্ত্রীজাতি চিরকালই অলঙ্কার ভালবাসে। পাষাণ চিত্রেও সুন্দরীদের হার চিক,

কর্ণভূষা বলয় ও মল আছে। স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান প্রণালী ঠিক পুরুষের মত না হইয়া তাহার সহিত অনেক সাদৃশ্য আছে। মাল-কোঁচার উপরে একখানি দু-মুখা বা এক-মুখা কোঁচা ঝুলান। মস্তকে নানাবিধ বেণী, এতগুলি মূর্ত্তির মধ্যে কেবল একটী দ্বার রক্ষকের জানুদেশ পর্য্যন্ত বস্ত্রের দ্বারা আবৃত। রাণীহংসপুর নির্ম্মাণের সময়ে ভারতবর্ষে কি প্রকার ভাষার প্রচলন ছিল তাহা পর্ব্বতখোদিত লিপি গুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। অশোক লিপি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—(১) পাঞ্জাবী পালি, (২) উজ্জয়িনী পালি, (৩) মাগধি পালি। লিপির—আকার দেখিয়াও স্থাপত্যের সময় নির্ণয় করা সহজ হয়।





পুতুল পূজা।

সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ উপাসনা প্রচলিত আছে বলিয়া অবস্থা ও অধিকারীর হিসাবে যে মূর্ত্তি কল্পনা আবশ্যক একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করেন। অচিন্ত্য অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় যাহার স্বরূপ তাঁহাকে নিরাকার বা সাকার কল্পনা করিয়া আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করা একান্ত আবশ্যক। মূর্ত্তি কল্পনা না করিলে উপায় নাই। ইউরোপে মধ্য যুগ পর্য্যন্ত Image, Worship (মূর্ত্তিপূজা) প্রচলিত ছিল, এখন পর্য্যন্ত রোমে পৌত্তলিকতা বিদ্যমান আছে। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্বেও পূর্ব্বভাব এখনও অটুট রহিয়াছে। মার্টিন লুথারের মতাবলম্বীরা এখনও সকল স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই যখন আমরা বলি সমুদায় উপনিষদ গাভী, অর্জ্জুন বৎস, গোপাল নন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্ত্তা, গীতারূপ অমৃত দুগ্ধ এবং সুধীগণ ভোক্তা তখন আমাদের মনে করিতে হইবে যে, অর্জ্জুনের মত আমাদের ধ্যান ও ধারণা হওয়া সম্ভবপর নহে। এই যে অর্জ্জুন বলিয়াছেন—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষ সঙ্ঘান্।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চদিব্যান ॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপম্ ॥

১৫।১৬—গীতা ১১শ অধ্যায়।

আমরা কি এত সহজে ভগবানকে দেখিতে পাই—

শুদ্ধ ব্যক্তির ক্রিয়মান কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব বোধ থাকে না বলিয়া কি আমরা কামনা রহিত হইয়া বালকের ন্যায় সকল কর্ম্মের আরম্ভ করিতে পারি।

"হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে ॥"

একথা সাধক কখন বলিতে পারে? যখন তাহার মনে "এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই" এই ভাবের উদয় হয়। ঈশ্বরকে আমরা স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, ত্রাণকর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা বলিয়া জানি। তিনি নির্গুণ হইলে এ সকল ক্রিয়া পাওয়া যায় না। জগৎ দেখিয়া আমরা ঈশ্বরের রূপ গুণ নিরূপণ করিতে পারি বটে কিন্তু মূর্ত্তিপূজা না থাকিলে ভক্তি বিকাশের উপায় কি? যতদিন মনুষ্য পূর্ণত্বপ্রাপ্ত না হয় ততদিন সে নিবৃত্তিমার্গের অধিকারী হয় না। প্রবৃত্তি মার্গানুসরণ পূর্ব্বক ক্রমে তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে আসিতে হইবে। এই জন্যই মহা পণ্ডিত ইমার্সন বলিয়াছেন—

" We must have idolatries, mythologies, some swing or verge for the creative power lying coiled and cram-

ped here driving ardent nature into insanity and crime if it does not find vent."

প্রতিমা পূজায় এই বিশেষ উপকার হয় যে, বাহ্য বিষয়ে একান্ত আসক্ত চিত্ত অজ্ঞান মানবকে পরম পুরুষার্থ বিষয়ে সহজে আকর্ষণ করিতে পারে। ইহাতে নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীত, আহার ব্যবহার সমস্তই আছে সুতরাং এরূপ কোন লোক নাই যে, ইহাতে আকৃষ্ট না হয়, সকল প্রকার লোককে ধর্ম্মপথে আনিতে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কৌশল আর নাই প্রথমে—"পূজা, অর্চ্চনা নানাবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য নিবেদন, বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দান করিলে ভক্তির বিকাশ হয়, দ্বিতীয়তঃ সাধকের নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির সংযত করা যায়।"

চিত্ত সংযমের প্রথম অবস্থায় ধ্যান করিতে হয়, আবার ধ্যান করিতে হইলে একটি প্রত্যক্ষ অবলম্বন আবশ্যক হয়। জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয় উপাধি শূন্য শরীর রহিত পরমেশ্বরের রূপ কল্পনা সাধকের সাহায্যের জন্য। মন সর্ব্বদাই লিঙ্গে, গুহ্যে,নাভিতে বাস করে। মনের আসক্তি কেবল সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে। হৃদয়ে যখন মনের বাস হয়, তখন ঈশ্বরের জ্যোতিঃ দর্শন হয়, কণ্ঠে যখন মনের বাস হয়, তখন কেবল ঈশ্বরের কথা কহিতে ও শুনিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপে ক্রমোন্নতি হইতে থাকে, তাই বলিয়া পুতুলের কেহ পূজা করে না। উহা কেবল উপলক্ষ মাত্র। পুতুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা হয় এবং পূজা করা হয়, যাহার চিন্ময় রূপ ধারণা করিবার উপযুক্ত মানসিক উন্নতি হয় নাই, তাহার পক্ষে জড়রূপ ধারণা করাই স্বাভাবিক। উপাসকদিগের কার্য্যের জন্য গুণ ও ক্রিয়ানুসারে রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। কালীর রূপ কৃষ্ণবর্ণ কেন-না, যেমন শ্বেত,

পীত প্রভৃতি বর্ণ কৃষ্ণবর্ণে লয় হয় সেইরূপ সমস্ত ভূতাদি কালীতে লয় হয়, তিনি যে কালশক্তি, তিনি যে নির্গুণা, তিনি যে নিরাকারা, তিনি যে যোগীদের মঙ্গলস্বরূপ তন্ত্রকার তাহাও বলিয়াছেন। তারপর নিত্য কালরূপা অব্যয়া অমৃতস্বরূপ বলিয়া তাহার ললাটে শশিচিহ্ন নিরূপণ করা হইয়াছে। কেন-না চন্দ্রই সুধার আকর, তিনি চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি এই তিন নেত্র দ্বারা দর্শন করিতেছেন। তিনি সমুদয় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কাল দণ্ডের দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীর রুধির সমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্ত বসন রূপে কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার হাতে অভয় রহিয়াছে বিপদকালে তিনিই অভয়-দায়িনী। তিনি সমস্ত জীবকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাই তাঁহার হস্তে বর আছে এই জগৎ রজোগুণে সৃষ্ট এবং তিনি ইহা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাই রক্ত পদ্মাসনস্থিতা দেবতাদিগের বীজমন্ত্র ধ্যান ইত্যাদিতে কত সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। Esoteric Significance (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা) বুঝিবার চেষ্টা করিলে কত সুফল লাভ হইতে পারে তাহা বোধ হয় কেহ ভাবেন না!

কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং।

অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান প্রদায়িনী যে কালিকা মূর্ত্তি তাহা বাসনারূপ মুণ্ড মালাতে সুসজ্জিত অর্থাৎ কর্ম্মের মুখরূপ বাসনাতেই প্রকৃতি পূর্ণ এই বাসনার নাশেই মুক্তি। যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণ জন্মমৃত্যু হয়।

মুক্তকেশীং ;—কেশেই স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্য মুক্তভাবে এই প্রকৃতি সমস্ত জীবের অধিকারে আছে।

মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং
কণ্ঠাবশক্ত মুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাম্।

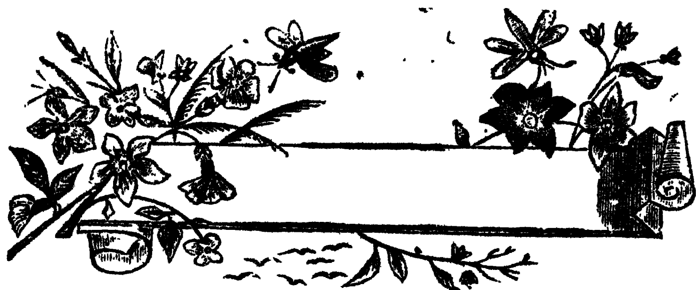
অর্থাৎ প্রকৃতির কর্ম্মরূপ রূপের প্রভা মেঘের ন্যায় সুন্দর। বেদান্তে অন্তঃকরণের বৃত্তিকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম বুদ্ধি, অনুসন্ধানের বৃত্তির নাম চিত্ত। এই অনুসন্ধানে যে বুদ্ধি হয়. সেই বুদ্ধিকে অহঙ্কাররূপ মেঘ আচ্ছাদন করে।

মোহিনীরূপিনী প্রকৃতি শুম্ভ দূতকে যাহা বলিতেছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃতির অধিপতি না হইলে শুম্ভের ন্যায় রাজারও সুখ নাই।

প্রকৃতির কার্য্যের ব্যাপার দর্শনের পর সাধক করাল-বদনের স্থলে "সুখ প্রসন্ন বদনাং—বলিলেন; আবার সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতেই "সত্যং শিব সুন্দরং" বলিতে হইয়াছে।

মা স্বাহা স্বধা ইত্যাদি সমস্তই তুমি বলিতে হইয়াছে। মহাদেব জ্ঞানের অবতার বা আদর্শ বলিয়া পঞ্চমুখে সমুদায় জ্ঞান সংগ্রহ করিতেছেন, লোকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ করে বলিয়া, মহাদেবের পঞ্চমুখ। তারপর কৈলাসপুরী যাঁহার বাসস্থান, কুবের যাঁহার ভাণ্ডারী, পার্ব্বতী যাঁহার গৃহিনী ইত্যাদি পার্থিব সম্পদে যে তিনি পূর্ণমাত্রায় অধিকারী, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও তিনি দিগম্বর, ছাই-ভস্ম মাখা শ্মশানবাসী। একাধারে ভোগের ও ত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন।





জলের মানুষ।

সমুদ্রে কত প্রকার জীব বাস করে, এখনও পর্য্যন্ত তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে আমাদের বিস্ময় ও হর্ষ প্রকাশ করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। জলের মধ্যে মানুষের বাস আছে, চিন্তা করিলে, ভগবানের মৎস্য-অবতারের কথা, ব্যাসের জননী মৎস্যগন্ধার কথা, শ্রীমন্তের কমলে-কামিনী দর্শনের কথা ও কালীয়ের পত্নীদের কথা মনে পড়ে। সিন্ধুঘোটক অনেকেই দেখিয়াছেন; কিন্তু বারিনিধি-বক্ষে যে অর্দ্ধ-মনুষ্যাকৃতি জীব বাস করে, তাহা বোধ হয় অল্প লোকেই শুনিয়াছেন। ইংরাজী পুস্তকে "Mermaid", "Nymph" ইত্যাদির কথা আছে বটে, কিন্তু সকলে তাহা বিশ্বাস করেন না। হোমারের 'অডেসিতে' যে সিন্ধুবালার কথা আছে, তাহাও কাল্পনিক বলিয়া মনে হয়। কাব্য-শাস্ত্রের উক্তিতে অর্দ্ধ-ঘোটক অর্দ্ধ-মনুষ্যাকার জীবের উল্লেখ আছে। রাশিচক্রেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বেলফাষ্ট-লফের নিকটবর্ত্তী বাঙ্গোর নামক স্থানে যে অর্দ্ধ-মনুষ্যাকৃতি জীব ধৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। সে 'মুরগেন' নামে অভিহিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। 'পুরাতত্ত্ব বার্ষিক'

বিবরণীতে' তাহাকে সিদ্ধলোক বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। Notes and Queries, Oct 21, 1082.) হারলেম নগরের মৎস্য-নারীর কথা এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সে বিষয় শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে কতিপয় গোয়ালিনী নৌকারোহণে ইডাম-পারমারলেক নামক জলপ্লাবিত স্থান দিয়া যাইবার সময় একটি মনুষ্য মস্তক দেখিতে পায়। "তাহারা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া নিকটে গিয়া দেখিল,—একটি সুন্দরী নারী জলমধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। নাভির উপরিভাগ হইতে ঐ নারীর সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানবীর ন্যায়; কিন্তু নাভির অধোভাগে চরণের পরিবর্ত্তে মৎস্যের আকার মাত্র।" তাহারা এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয় এবং অনেক কৌশলে তাহাকে ধৃত করিয়া হারলেম নগরে লইয়া যায়। তথায় সে ১৬ বৎসর জীবিত ছিল এবং মনুষ্যের মত বেশ আহারাদি করিত। সে সূতা কাটিতে শিক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু কথা কহিতে পারিত না। তাহার মৃত্যু হইলে তথাকার অধিবাসীগণ সমবেত হইয়া তাহার কবর দিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ডগলাস সহরে কতিপয় বণিক এই শ্রেণীর একটি জীব আনিয়াছিলেন। সফোকস্থ অরফোর্ড দুর্গে এই শ্রেণীর আর একটি জীবকে রাখা হইয়াছিল (Stowe's Annals)। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের পক্ষে এরূপ দেহ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে (Joyce's Old Celtic Romances)। অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিলে আরও জানিতে পারা যায় যে, "মারমেডগণ" মনুষ্যের মত স্থলে বাস করিয়াছে এবং মনুষ্যের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। তবে তাহাদের সহিত পরিণয় বড়ই অশান্তি-প্রদ, তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মনুষ্যের সহিত স্থলে বাস করা "মারমেডের" পক্ষে যেমন সহজ, কোনও দোষ পাইলে মানব-স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অগাধ জলধি-

মধ্যে পুনর্গমনও তদ্রূপ সাধ্যায়ত্ত। তাহারা অনেক সময়ে মানুষকে প্রতারিত করিয়াছে, হাবভাবে মুগ্ধ করিয়া জলমধ্যে বাস করাইয়াছে। কোরিভরেকিণের একটি নীর-নারী ম্যাকৃফেইল নামক এক ব্যক্তিকে অনুপম রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ম্যাকৃফেইল কয়েক বৎসর জলের মধ্যে বাস করিয়াছিল। আমি একজন ইংরাজের নিকট গল্প শুনিয়াছি যে, ম্যাকৃফেইল মৎস্য ধরিবার জন্য গমন করিলে একটি নীর-নারী তাহাকে জলের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। ৩।৪ বৎসরের মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। একদিন ম্যাকৃফেইলের পিতা ঘটনাচক্রে সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র ম্যাকৃফেইল ভাসিয়া উঠে। তাহার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। পিতার নিকট সে সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করে। ইহার পর অনেক দিন সে জীবিত ছিল এবং বহুসংখ্যক লোকের ব্যাধিমুক্ত করিয়াছিল। স্কটের একখানি পুস্তকেও মারমেডের কথা পাওয়া যায় (Scott's Border Minstrelsy)। মেলুসিনা নামক মৎস্য-নারী সম্বন্ধে জীন-ডি-য্যারাজ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সেই মেলুসিনার সহিত সম্রাট সপ্তম হেনরীর পূর্ব্বপুরুষ রেমণ্ড-অফ-রোসেলিনের বিবাহ হইয়াছিল।

অনেক দিন হইল, (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে) চিল্কা হ্রদের উপকূলে একটি মানবাকৃতি জীবের মস্তক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখকের নয়নগোচর হইয়াছিল। আরও যে তিন জন তাহা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা যাইতেছে ;—(১) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ পাঠক, সাং পুরী ; (২) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মণ্ডল, সাং বাঁটরা ; (৩) ৺শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং শিহটী শিবপুর। সে জীবটির মুখশ্রী—কতকটা খাজড় রমণীর মত। ডুবে সরিয়া গিয়া সে যখন শুশুকের মত উল্টান খাইল, তখন তাহার

মৎস্য-পুচ্ছাকার পশ্চাদ্ভাগ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। শ্যামবাবু সেই পুচ্ছ আমাদিগকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—এটি নিশ্চয়ই জলের মানুষ।

কিছুদিন হইল, কলিকাতা ধর্ম্মতলায় এক সাহেব একটি "মারমেড" আনিয়াছিলেন। তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। এই জীবটী দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট হইবে। আমি যখন ঐ জীবকে দেখিতে যাই, চাঁদনীর কয়েকজন প্রসিদ্ধ দোকানদার তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। উপরে যে সকল জলের মানুষের কথা কহিয়াছি—তাহাদের সকলের চেহারা রুষের রুসালকার মত। সকলেই সুন্দরী, সুকেশা ও মনোহারিণী এবং কেহ কেহ সুমধুর স্বরে গান করিতে পারিত। গত ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভবানীপুরে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, সেই উপলক্ষে ঐ রকম দুইটি জলের মানুষ (Mermaid) সেই প্রদর্শনীক্ষেত্রে আসিয়াছিল। তাহাদের আকৃতি রুসালকার মত নহে। তাহাদের উপরিভাগ মনুষ্যাকৃতি, নাভি হইতে নিম্নদিক মৎস্যের মত। উভয়েরই মস্তক কেশহীন, চক্ষু গোল, ভ্রূ নাই, নাক চ্যাপ্টা, মুখ মৎস্যের মত, কাণগুলি ইন্দুরের মত, হাত দুইটা কাঁধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত ঠিক মনুষ্যের ন্যায়; কিন্তু কনুইয়ের নীচু দিকের গঠন পাতিহাঁসের মত। স্ত্রীজাতীয় জীবটীর দুইটী স্তন আছে। তবে তাহা মনুষ্যের স্তনের ন্যায় তত বড় নহে। সকলের অবগতির জন্য অপর পৃষ্ঠায় একটা (Mermaid) জলের মানুষের চিত্র দেওয়া গেল।

হার্ণ্ট বলেন (Popular Romances of the West England) মৎস্য-নারী মনুষ্যকে অসাধারণ ও অপার্থিব ক্ষমতাশালী করিতে পারে। তাহাদের মন্ত্র প্রভাবে কেহ কেহ ব্যাধি হইতেও মুক্তি লাভ করিয়াছে, এবং আরও অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে। মারমেড সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করা



জলের মানুষ। (Mermaid.)

কর্ত্তব্য। (১) Baring Gould's *Myths of the Middle Ages*, (২) Waldron and Train's *Isle of Man*, (৩) Napier's *South of Scotland*, (৪) Chamber's *Book of Days*, (৫) Denni's *Folklore of China*, (৬) Jones' *Traditions of the North American Indians* ইত্যাদি।





নিগ্রোধ।

চন্দ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিগণের বংশে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন,তাঁহাদের মধ্যে নিগ্রোধ ও দ্বরা—কৌস্তুভ ও কহিনুর। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে জগতের উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই যে এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম এত আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে যেমন নিগ্রোধকে দেখিতে পাই, সেইরূপ ইউরোপে উপনিষদাদির চর্চ্চার মধ্যে দ্বরাকে দেখিতে পাই।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে নিগ্রোধের কথাই বলিব। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক পিতৃরাজ্যপ্রাপ্তির আশায় সুমন ও অপর ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিলেন; কেবল মাত্র কনিষ্ঠ সহোদর তিষ্যের প্রাণসংহার করিলেন না। সুমনের পত্নী অন্তর্বর্ত্নী ছিলেন। নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তিনি এত বিচলিত হইলেন যে, রাজধানী পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া, সমীপবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, তিনি এক বটবৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে অনেক চণ্ডালের বসতি ছিল। সহসা তিনি তাহাদের নায়কের দৃষ্টিগোচরে পতিত হইলেন। নায়ক বনমধ্যে অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না সুন্দরীকে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গিয়া পরিচয় লইল। তখন, নায়ক সেই আতপ-তাপিত বৃন্তচ্যুত

কুসুমের ন্যায় আশ্রয়হীনার আশ্রয় হইল। যাহার "আপনার" বলিতে কেহ বা কোন কিছু থাকে না, ভগবান তাহাকে সাহায্য করেন। একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

So, when our worldly all is reft
Our worldly helpers gone
We still have one sure anchor left
God helps and He alone.

চণ্ডাল-নায়কের আশ্রয়ে, সেই বিপন্ন অবস্থায়, যুবরাজ-পত্নী একটি সুলক্ষণসম্পন্ন সুকুমার প্রসব করিলেন।

বালক দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়দর্শন হইতে লাগিল। সকলেই তাহাকে নিগ্রোধ বলিত। বটের নামের মধ্যে "ন্যগ্রোধ" পাওয়া যায়। যথা,—

"বটোরক্তফলং শৃঙ্গী 'ন্যগ্রোধ' স্কন্দজোধ্রুব ক্ষীরী বৈশ্রবণাবাসো
বহুপাদো বনস্পতি।"

শমীক মুনির পুত্রের ও এই বালকের নামকরণ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে পারা যায় না। নিগ্রোধ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে, জনৈক বৌদ্ধ-স্থবির 'মহাবরুণ' তাহাকে ভিক্ষু-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদবধি তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী হইলেন।

সময়ের গতি অতীব বিচিত্র। একদিন নিগ্রোধ রাজবাড়ীর নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। সম্রাট অশোক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া রাজসভায় আহ্বান করাইলেন। তাঁহার শ্রীমুখ বিনির্গত সরলতাপূর্ণ অমিয়মাখা বচনাবলি শ্রবণ করিয়া সাদরে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার নিকট অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সার মর্ম্ম অবগত হইলেন।

নিগ্রোধ নির্ব্বাণ-সম্বন্ধে অশোকের নিকট যাহা বলিয়াছিলেন,

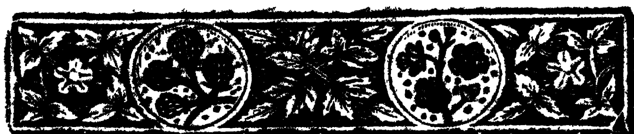
তন্মধ্যে 'ধর্ম্মপাদের' এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ নিগ্রোধ বলিয়াছিলেন,—

"অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তী যে পমত্ত যথা মতা
এতং বিসেসতো এত্বা—অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিয়াণং গোচরে রতা
তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্হ পরক্কমা
ফুসন্তি ধীরা নির্ব্বাণং যোগং ক্খেমং অনুত্তরং।"

অর্থাৎ—"প্রমাদ মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ। ধর্ম্মাচরণে তৎপর ব্যক্তিগণ মরেন না, প্রমত্ত ব্যক্তিগণ মৃতস্বরূপ। যাঁহারা অপ্রমাদ-পরায়ণ হইয়াছেন এবং সর্ব্বদা নির্ব্বাণ-মার্গাবলম্বীর জ্ঞানে বিহার করেন, তাঁহারা মার্গাবলম্বীর পরাশান্তিস্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন।"

নিগ্রোধের সাক্ষাৎকারের ফলেই ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মে নবজীবনের সঞ্চার হয়।





আউলচাঁদ।

যে বৈষ্ণবধর্ম্ম পতিতের গতি, সুখের নিদান, প্রেমের প্রস্রবণ ও সংসার মরুভূমির শান্ত ছায়াকুঞ্জ, মহাত্মা আউলচাঁদ তাহারই শাখা বিশেষের প্রবর্ত্তক — বঙ্গদেশবাসী মাত্রেই অবগত আছেন যে, কর্ত্তাভজা বা একঘুনে নামক একটি সম্প্রদায় আছে। কাঁচড়াপাড়ার নিকটে ঘোষপাড়াই তাহাদের পীঠস্থান. এইখানে মহাত্মা আউলচাঁদের প্রধান শিষ্য রামশরণ পালের বংশধর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র পাল মহাশয়ের চেষ্টায় আউলচাঁদের মহনীয় কীর্ত্তিকলাপ, প্রগাঢ় হরিভক্তি ও দৈবশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পারস্য ভাষায় দৈবশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে "আউলিয়া" বলে। আউলিয়া হইতেই তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল। তাঁহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে যেমন বিস্মিত হইতে হয়, তেমনই হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়।

দুইশত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামে মহাদেব দাস নামে একজন বারুই ছিল। সে একদিন পান-বরজের মধ্যে একটী পরম সুন্দর শিশুকে দেখিতে পায়, মহাদেবের সন্তানসন্ততি ছিল না; সে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বালকটীকে বাটীতে আনয়ন করিলে, তাহার স্ত্রী শিশুটীকে পরম সুন্দর দেখিয়া তাহার নাম 'পূর্ণচন্দ্র' রাখিল এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিল। বালক ক্রমশঃ শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন তাহার

বয়স অনুমান আটবৎসর, তখন মহাদেব বালককে গোচারণে নিযুক্ত করিল। পূর্ণচন্দ্রকে মহাদেবের সংসারে আরও অনেক কাজ করিতে হইত। ইহার জন্য বালককে অনেক সময় নির্যাতন ভোগ করিতে হইত, তাহার কর্কশ ভাষা ও প্রহারের দারুণ যন্ত্রণায় একদিন পূর্ণচন্দ্রের প্রাণ প্রয়াণের উপক্রম হইয়াছিল।

পাঁচ বৎসর মহাদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া পূর্ণচন্দ্র সেই গ্রামে হরিহর বণিক নামক এক ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইলেন। হরিহরের বাটীতে সুমধুর হরিসংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ, এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশেষভাবে আলোচনা হইত, পূর্ণচন্দ্র দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া সময় পাইলেই হরিহরের নিকট গমন করিতেন। হরিহর তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন এবং সময় পাইলে একটু একটু সংস্কৃত পড়াইতেন। পূর্ণচন্দ্রের প্রতি মহাদেব যে পশুর ন্যায় ব্যবহার করিত, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। উপর্য্যুপরি তাড়নার পর মহাদেবের বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ণচন্দ্র হরিহরের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে পাইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে হরিহরের নিকটে বিদায় লইয়া ১৬২৩ শকে পূর্ণচন্দ্র শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন—এইখান হইতে তিনি উদাসীন হইয়া "আউলচাঁদ" নামে অভিহিত হইলেন এবং তাঁহার গুরু বলরাম দাসের আশ্রয়ে দেড় বৎসর বাস করেন। তৎপরে গুরুশিষ্যে পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, সেখান হইতে তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়া তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। তীর্থপর্য্যটনের পর তিনি বজরা গ্রামে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। তাঁহাদের বাইশ জনের নাম পাওয়া যায় যথা,—

হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল।
লক্ষ্মীকান্ত, নিত্যানন্দ, খেলারাম মাল॥
কৃষ্ণদাস, হরিদাস, নয়ন শঙ্কর।
বিষ্ণুদাস, ভীমরায়, কিনু মনোহর॥
নিধিরাম, শিশুরাম, আনন্দ, নিতাই।
শ্যামচাঁদ, পাঁচুমুচি, গোবিন্দ, কানাই॥

রামশরণের উপরই আউলচাঁদের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তিনি রামশরণকে শূলব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। সম্প্রদায়ের সমস্ত বায়সঙ্কুলান করিয়া যাহা উদ্বর্ত্ত হইত, তাহা রামশরণেরই প্রাপ্য হইত। এই সময় রামশরণের জননী জীবিতা ছিলেন বলিয়া তিনি গুরুর ন্যায় একেবারে গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আউলচাঁদের ভক্তেরা বলিতেন---শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপের লীলাসম্বরণ করিয়া পুনরায় আউলচাঁদ-রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা রামশরণের সহধর্ম্মিণীকে শচি বা সতী-মা বলিয়া ডাকিত। আউলচাঁদকে তাঁহারা কর্ত্তা বলিতেন। তিনি ভিক্ষা করিতেন বটে কিন্তু অতিথি সৎকার---ধর্ম্মপ্রচার উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের স্বহস্তে সেবা করাই তাঁহার প্রধানকার্য্য ছিল। এই শান্তিময় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এককালে যে কত নিরক্ষর নরাধমের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেম উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

"প্রকৃতি সাধন বিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায়ের অনেকরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু বোধ হয়, কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদারভাব অবলম্বন করিতে পারেন নাই, ইহাদের পরমার্থ সাধন কেবল দুই একটী নিম্ন প্রকৃতি সহবাসে পর্য্যাপ্ত হয় না। কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য ইচ্ছানুরূপ বহুতর পণ্ডিত ও অপণ্ডিত স্ত্রীপুরুষ ইহাদের সাধন

সম্প্রদানে নিযুক্ত থাকে; ফলতঃ ইহারা কিরূপ মতাবলম্বী তাহা কি বলিব? শুনিয়াছি ইহাদের স্বভাব বড়ই উদার, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি এ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান পায় না। যাঁহারা প্রকৃত আউলচাঁদের শিষ্য তাহাদের প্রকৃতি বড়ই অমায়িক। বাউল ও নেড়ারা যেরূপ শ্মশ্রু ও গুণ্ঠলোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, আউলচাঁদের শিষ্যবর্গ সেরূপ করে না। শ্মশ্রু-লোমাদি সমস্তই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। ৪০।৫০ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটী আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল, এক্ষণে ঐ সম্প্রদায়ী লোক এ প্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।" আউলচাঁদ শিষ্যদিগকে দশটী কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন যথা,—

১।	পরস্ত্রী গমন	কায়িক
২।	পরদ্রব্য হরণ	
৩।	জীবহত্যা করন	
৪।	মিথ্যা কথন	বাচনিক
৫।	কটুবাক্য প্রয়োগ	
৬।	অনর্থক বাক্যকথন	
৭।	প্রলাপ ভাষণ	
৮।	পরস্ত্রী গমনেচ্ছা	মানসিক
৯।	পরদ্রব্য হরণেচ্ছা	
১০।	জীবহত্যা করনেচ্ছা	

১৬৯১ শকের বৈশাখ মাসে সায়ং সময়ে বোয়ালিয়া গ্রামে ভক্ত-কুলমণি আউলচাঁদের প্রাণবায়ু বিনির্গত হয়। প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমাতে ঘোষপাড়ায় পূর্ণচন্দ্র আউলচাঁদের গুণানুকীর্ত্তন হইয়া থাকে। এখনও যেন তাঁহার উজ্জ্বল চিত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে।



চটসাঁই বাবাজী। *

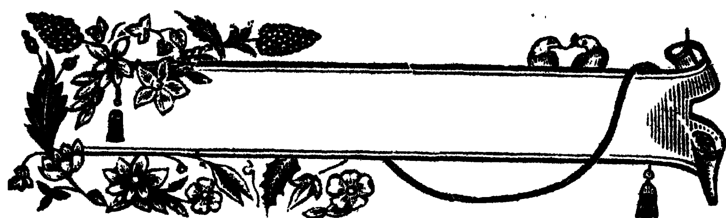
বিগত ১৩২০ সালের ১৮ই মাঘ, সরস্বতী পূজার দিন হাওড়া—শালকিয়ার চটসাঁই বাবাজী অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। চটসাঁই বাবাজীর পূর্ব্ব-পরিচয় কেহ অবগত নহেন। তিনি যদিও অনেক দিন শালকিয়ায় ছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার নাম ধাম জানিতে পারেন নাই, তাঁহার কথাবার্ত্তা ঢাকা—বিক্রমপুর অঞ্চলের লোকের মত ছিল। শালকিয়া নিবাসী বাবু কুঞ্জবিহারী সিংহ এই মহাপুরুষকে লিলুয়ার "পেয়ারাবাগান" হইতে লইয়া আসেন। কুঞ্জবাবু অনেক যত্ন করিতেন বটে কিন্তু "চটসাঁই" সর্ব্বদাই বিষ্ঠা মাখিতেন, কাহারও সহিত কথা কহিতেন না। যাহা হউক ২।৩ বৎসরের পর "চটসাঁই"এর একটু পরিবর্ত্তন হয়। তিনি চট পরিধান করিতেন এবং চটের জামা গায়ে দিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে চটসাঁই বলিতে আরম্ভ করে। ইদানীং তিনি বাবুর মত বেশ ভূষা করিতেন এবং মাথায় "কৃষ্ণচূড়া" বাঁধিতেন। তিনি সর্ব্বদাই রসিকতা করিতেন, তাঁহার কথা শুনিলে প্রাণ জুড়াইত। শালকিয়া নিবাসী বাবু গণেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের

---

* সম্মিলনী।

জননীর প্রদত্ত জমিতে তাঁহার "আশ্রম" ছিল ; এইখানে প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া তিনি ১৫০।২০০ লোককে অন্ন দিতেন।. তিনি স্বহস্তে রন্ধন ও পরিবেষণ করিতেন। স্থানীয় দোকানদারগণ ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর নিকট যথাসাধ্য সাহায্য পাইতেন। তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহার মৃতদেহ লইয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। তিনি যেখানে থাকিতেন, সেইখানেই উহা ভস্মসাৎ করা হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার স্মৃতি-চিহ্ন রাখিবেন। চটসাঁই বাবাজীর ন্যায় সাধু দুর্লভ।





মমতাজমহল।

সেকালের বাদসাহের বাড়ীতে স্ত্রীলোকের একটী মেলা বসিত। তাহাকে "খোসরোজ" বলিত। জাহাঙ্গীর বাদসাহের আমলে খোস্-রোজের কথা দেশ বিদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মেলার সময় মহিলাগণ বাদসাহের অন্তঃপুরে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে নানাবিধ শিল্প-কলার দোকান খুলিয়া বসিতেন। খোসরোজ উপলক্ষে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজ ও আমীর-ওমারহগণ পরওয়ানা পাইতেন। তাঁহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণও এই মেলায় আসিতেন। তাঁহারাও দোকান সাজাইয়া বসিতেন। বাদসাহ-পরিবার প্রত্যেক বিক্রয়কারীর নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক সময় দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন।

একবার জাহাঙ্গীর বাদসাহ মণি-মুক্তা-জড়োয়ার সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের একত্র সমাবেশের জন্য এক খোসরোজ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে জামাল খাঁ নামক একজন ওমারাহ, তাঁহার পত্নী আর্জ্জমন্দবানুকে বাদসাহের অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন। এই যুবতীর নবোদিত শশিকলার ন্যায় রূপকান্তি, নবনলিনীর ন্যায় মুখকান্তি, ইন্দিবরনিন্দী উজ্জ্বল নয়ন ও পীযুষনিস্যন্দী কণ্ঠস্বর—বাদসাহের পুত্র খুরমের (সাজেহানের) মনঃ-

প্রাণবিচলিত করে। অলক্ষ্যে থাকিয়া, সেই রূপ দেখিয়া, মেলা-শেষে, আর্জ্জমন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া খুরম কহিলেন,—“সুন্দরি! তোমার নিকট আর কোন্ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আছে?” সুন্দরী বলিলেন,—“একটি দ্রব্য বিক্রয় হয় নাই। কারণ, তাহার মূল্য দিবার লোক দেখিলাম না। আপনার ইচ্ছা হইলে, সেই দ্রব্যটী ক্রয় করিতে পারেন।” এই বলিয়া, ঈশ্বরের সুনিপুণ-সৃষ্টি, কন্দর্পের শাণিত-শায়ক আর্জ্জমন্দ, এক-খণ্ড মিছরী যুবরাজ খুরমের হস্তে দিলেন। যুবরাজ সেই মিছরীখণ্ড লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করিলেন, এবং আর্জ্জমন্দকে নিজ প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন। সেদিন গভীর রাত্রিতে আমোদ-প্রমোদের পর আর্জ্জমন্দ বাড়ী ফিরিলেন। ইহাতে জামাল খাঁ, তাঁহাকে কলঙ্কিনী ভাবিয়া, তাঁহার মুখাবলোকন করিলেন না। মনঃক্ষোভে জামাল খাঁ পরদিবস গৃহত্যাগী হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। খুরম, এই সংবাদ পাইয়া, জামালের পত্নীকে বাদসাহের অন্তঃপুরে আনিয়া মহাসমারোহে বিবাহ করিলেন। ইংরাজী ১৬২৭ সালে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর খুরম সিংহাসন প্রাপ্ত হন। খুরম সম্রাট হইয়া পত্নীর নাম মমতাজমহল রাখিলেন। তিনি মমতাজমহলকে এত ভাল বাসিতেন যে, তাঁহার সমাধির উপর যে অত্যাশ্চর্য্য সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।





কণ্ঠসঙ্গীত।

নাদের উৎপত্তি সংঘর্ষে, শাস্ত্রমতে নাদই সঙ্গীতের মূল। নাদ দ্বিবিধ—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক নাদের উৎপত্তি বস্তুর ঘাত প্রতিঘাতে আর বর্ণাত্মক নাদের উৎপত্তি প্রাণীগণের কণ্ঠতালুর ঘাত প্রতিঘাতে; সরলভাবে বলিলে ইহাতে যন্ত্রসঙ্গীত ও কণ্ঠসঙ্গীত বুঝায়। সঙ্গীতে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই সপ্তটী শুদ্ধ স্বর। এই সপ্ত শুদ্ধ স্বর হইতেই স ঋ গ ম প্রভৃতি রাগ রাগিণীর মূলের উৎপত্তি। যে সময়ে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিৎ স্বর সংযোগে সাম গান গীত হইত সেই সময়েই এই সপ্তস্বর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহামুনি ভরত সামবেদের উপবেদরূপে গান্ধর্ব্ববেদে সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। সপ্তস্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর নাম ঃ—অগ্নি, ব্রহ্মা, সরস্বতী, মহাদেব, লক্ষ্মী, গণেশ ও সূর্য্য—

		মূল	অন্ত্য
১।	স	দন্ত	কণ্ঠ
২।	ঋ	মূর্দ্ধ	তালু
৩।	গ	কণ্ঠ	
৪।	ম	ওষ্ঠ × নাসিকা	কণ্ঠ
৫।	প	ওষ্ঠ	ঐ

		মূল	অভ্যা
৬।	ধ	দন্ত	ঐ
৭।	নি	দন্ত+নাসিকা	

এই সপ্ত স্বরের সমাবেশ পদ্ধতি অনুসারেই প্রত্যেক রাগের উৎপত্তি হইয়াছে যেমন শ্রীরাগে স ঋ গ ম প ধ নি স ঋ।

নিম্নে ছয় রাগ ও তদাশ্রিত ছত্রিশ রাগিণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী।

শ্রীরাগ	বসন্ত	পঞ্চম	ভৈরব	মেঘ	নটনারায়ণ
মালশ্রী	দেশী	বিভাস	ভৈরবী	মল্লারী	কামোদী
ত্রিবণী	দেবগিরি	ভূপালী	গুর্জ্জরী	গৌরবী	কল্যাণী
গৌরী	বরটী	কর্ণাটী	বার্মাক্রী	সারেঙ্গী	আভীরী
কেদারী	তোড়িকা	বড়হংসিকা	গুণাক্রী	কৌশিকী	নটিকা
গান্ধারী মধুমাধবী	ললিতা	মালবী	বাঙ্গালী	গান্ধারী	সারঙ্গী
পহাড়ী	হিন্দোলী	পটমঞ্জরী	সৈন্ধবী	হরশৃঙ্গারা	হাম্বিরা

এই ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী হইতে অনেক উপরাগ ও উপরাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে।

তাহাদের তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য মূর্চ্ছনা তান তাল মান গমক আছে। এবং কোন সময়ে কোন রাগ-রাগিনী আলাপ করিতে হয়, তাহারও সুন্দর ব্যবস্থা হইয়াছে; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা যায় না। (১) একতালা। (২) ঢিমে তেতালা (৩) কাওয়ালী (৪) তেওরা। (৫) সুরফাঁকতাল (৬) সোফারী প্রভৃতি তালই বোল রকমের। (সঙ্গীত দামোদর)

আবার রাগ-রাগিণীর ও কৌশিক, হিন্দোল দীপক ইত্যাদি অঙ্ক নাম আছে। * এবং প্রত্যেকেরই রূপের বর্ণনা আছে। আমাদের সপ্তস্বর পাশ্চাত্য জগতে ফা, সল, লা, সি, ডু, রি মি বলিয়া পরিচিত। *

আমাদের উদারা মুদারা তারা সাহেবদের বাস টেনর, সোপ্রাণো (ট্রিবল্) সবই আছে বটে † কিন্তু ছয় ঋতুতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী আলাপ করিবার ব্যবস্থা ভারতবর্ষের মত কোন দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

দীপক রাগ আলাপনে তানসেনের মৃত্যু হইয়াছিল। এ কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাতার প্রসিদ্ধ গায়ক মণ্ডলা বক্সের গানে ফুলের কুঁড়ি ফুটিতে দেখিয়াছেন।

এখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সঙ্গীত-শাস্ত্রের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া কোন সঙ্গীত গীত হয় না। সুতরাং রাগ-রাগিণীর প্রভাবের স্বার্থকতাও দেখিতে পাই না। সকল বিষয়েই সমান অধঃপতন ঘটিয়াছে।

মন্ত্রোচ্চারণে এখন অভীষ্ট ফললাভ হয় না। সঙ্গীত আলাপনে সঙ্গীতের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাই না।

মেঘমল্লার আলাপ করিলে অনাবৃষ্টির সময়ে আকাশে মেঘের সঞ্চয় হইত। বারি-বর্ষণে পৃথিবী স্নিগ্ধ হইতেন, ভৈরব রাগ আলাপনে উষার আবির্ভাব হইত; মৃদুমন্দ-গন্ধবাহী বায়ু-সঞ্চারে বিহঙ্গমগণের কলরবে এবং প্রভাতের সুখস্পর্শে প্রাণ নাচিয়া উঠিত। হিন্দোল রাগ আলাপনে যেন নব বসন্তের সমাগম হইত। নব মুকুলিত কুসুমের

* "A wide diversity of opinion is found to exist among the Sanskrit Musical authorities in regard to Ragas & Raginis"—Six Ragas and Thirtysix Raginis By Raja Sir Saurindra Mohan Tagore, Kt., C.I.E., Mus. Duc.

† H. de Romestin's St. Ambrose | John Hullah's Works.

সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিত। শ্রীরাগ আলাপ করিলে প্রদোষ কালের সমাগম অনুভূত হইত; পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম বিভা বিকাশ পাইত; দিবাবসানে নৈশ-নীরবতায় যেন সংসার ছাইয়া ফেলিত। বেহাগ রাগিণীর আলাপনে প্রাণে ঔদাস্যের সঞ্চার হইত। যেমন এক এক রাগের এক এক প্রকার কার্য্যকারিতা আছে, তেমনি এক একটী রাগিণীরও অভিনব শক্তির পরিচয় পাই।* আবার প্রত্যেকেরই রূপ-কল্পনা করা হইয়াছে; যথা—

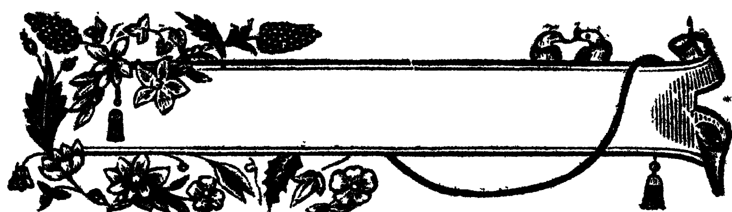
শ্রীরাগ।

লীলা বিহারেন বনান্তরালে চিন্বন প্রসূনানি বহু সহায়ঃ।
বিলাস বেশো ধৃতদিব্যমূর্ত্তি শ্রীরাগ এস কথিত কবীন্দ্রে॥

হেমন্তে শিশিরে বসন্তে গ্রীষ্মে শরতে ও বর্ষায় যথাক্রমে সস্ত্রীক নটনারায়ণ, শ্রীরাগ, বসন্ত ভৈরব পঞ্চম ও মেঘরাগ আলাপনের নিয়ম আছে কিন্তু এখন আর ভারতের সেদিন নাই।

* Prithibir Itihash.





পঞ্চ-মকার।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুন মে বচ।
মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

এই পঞ্চমকারের সাধনা করিতে পারিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

(১) যদুক্তং নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনং।
তস্মিন্ প্রমোদনং জ্ঞান তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতং॥

নিষ্কল নির্গুণ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন যে ব্রহ্ম, তাহাতে মত্ততা জ্ঞানের নামই মদ্য। এই মদ্য পানে মত্ততা জন্মাইলে পুনর্জ্জন্ম কি আর হয়?

(২) মাং স্যুনোত্তিহী যৎকর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতং।
ন চকারি প্রতিকন্তু যোগির্ভিমাংস মুচ্যতে॥

কামনা রহিত হইয়া যে কর্ম্ম ভগবানেতে সমর্পণ করা যায় তাহার নাম মাংস।

ভগবদ্গীতাতে বলিতেছেন—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পনং॥

৯।২৭ গীতা।

তার পর মৎস্যং

(৩) মৎসমানং সর্ব্বভূতে সুখে দুঃখে চ শৈলজে।
ইতি যৎসাত্ত্বিকং জ্ঞানং তন্মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতং॥

হে শৈলজে! আমার ন্যায় সর্ব্বভূতে ও সুখে দুঃখে যে সমজ্ঞান, সেই সাত্ত্বিক জ্ঞানের নাম মৎস্যং।

(৪) সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তি অসৎ সঙ্গেষু বন্ধনং;
অসৎ সঙ্গ মুদ্রনং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতং॥

* সৎসঙ্গে মুক্তি ও অসৎ † সঙ্গে বন্ধন এই অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগের নাম মুদ্রা।

(৫) কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগং মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতং॥

আধার চক্রের ঠিক নিম্নে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিদিগের দেহ ধারণ করিয়া আছেন, যোগ-বল দ্বারা ষট্চক্র ভেদ পূর্ব্বক ঐ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রায় পরম শিবের সহিত সংযোগ করার নাম মৈথুন।

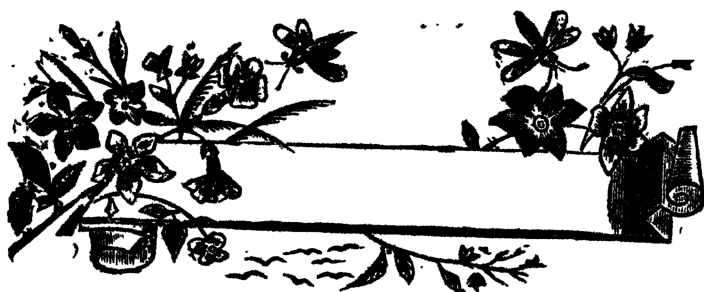
এই পঞ্চমকার বেদানুমোদিত।

---

* নিত্য বস্তুর ধ্যান।

† মায়া।





বাল্য-বিবাহ।

বাল্য-বিবাহে শারীরিক অবনতি হয়, একথা বিজ্ঞান স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে জানিয়াও কেন আমরা নিশ্চিন্ত আছি? বাল্য-বিবাহের প্রশ্রয় দিতেছি? চিরকালই কি আমরা কল্পনার দাস হইয়া থাকিব? কন্যা অবিবাহিতা অবস্থায় ঋতুমতী হইলে, তাহার পিতার ব্রহ্মহত্যার পাতক হইবে, এই বিশ্বাসেই কি আমরা বয়সের কড়াকড়ি নিয়ম চালাইব? আর্য্যদিগের মধ্যে যে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মনুর মতে পুরুষ ২৪ বৎসরে বিবাহ করিবে। বালিকারা উপযুক্ত হইলেই তাহাদের বিবাহ হইবে। অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া সংসারের ভার বহন করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। "বালক-বালিকার উপযুক্ত বয়স হইবার পূর্ব্বে কোন বালক-বালিকাকে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে চিরাবদ্ধ করিবার অধিকার কাহারও নাই"—"নাবালকের এক কাঠা ভূমি কাহারও দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই তবে কি তাহার দেহ মন জীবন চিরদিনের জন্য

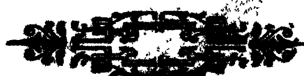
বিক্রীত করিবার অধিকার কাহারও থাকা উচিত? না, এরূপ অধিকারের কথা মনুও বলেন নাই”

কামনা মরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যর্তু মত্যাপি
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।

ইহার দ্বারা এই বুঝিতে পারা যায় যে কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন গৃহে থাকিলেও তাহার পিতার ব্রহ্মহত্যার পাতকের ভয় নাই এবং যতদিন পর্যান্ত বিদ্যাদি গুণসম্পন্ন পুরুষ না পাওয়া যায়, ততদিন তাহার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে, তার পর মনু আবার বলিতেছেন—

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধি গচ্ছেদ্‌ যদি স্বয়ং
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধি গচ্ছতি।

অর্থাৎ পিত্রাদি কর্ত্তৃক অদীয়মানা যদি যথাকালে ভর্ত্তাকে বরণ করে, তাহাতে কন্যার কিছুমাত্র দোষ হয় না এবং ভর্ত্তারও কোন দোষ নাই। তবে ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাতকের উল্লেখ হয় কেন? এ সকল কথা যদি দেশের লোক না বুঝে তাহা হইলে উপায় কি? একজন সাহেব বলিয়াছেন,—“We fear the task is beyond our power; we can give publicity to your grievances but reform must come from the Hindu community itself” কবে আমরা পঙ্কিল সমাজের পঙ্কোদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইব? কবে আমরা অসাড় সুপ্ত-সমাজের চেতনা সঞ্চার করিব?





বামা-ক্ষেপা চরিত।

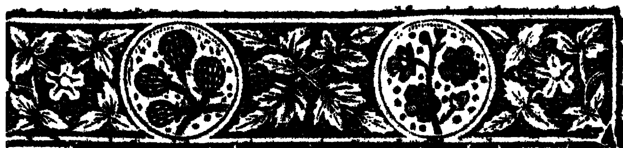
তারাপীঠের বামা-ক্ষেপার কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি অলৌকিক শক্তিমান ছিলেন এ কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সাধুবাদ করিয়া একখানি জীবন-চরিত ও রচনা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমার কিছু বক্তব্য আছে। যদিও তাহাতে ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষতি হয় কিন্তু সে ক্ষতি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে বরং তাহাতে সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। মনে রাখিবেন যে,—"মদ্য পানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভতে বৈ। মদ্য পান রতঃ সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ॥" তারাপীঠে শক্তি বৈষ্ণবের সমন্বয় হইয়াছে বলিলে পঞ্চ-মকার সত্য সত্যই জীবকে বিপথগামী করিবার জন্য শাস্ত্র বাক্য-রূপে উক্ত হইয়াছে বলিতে হয়।

জীবন-চরিত পাঠ করিতে হইলে সতর্ক হওয়া উচিত কারণ সত্য কথা সকল সময়ে পাওয়া যায় না। জীবন-চরিত রচয়িতার উদ্দেশ্যই প্রশংসা করা। এ ক্ষেত্রে যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারেন না। ম্যাবট, নেপালিয়নের কোন দোষ দেখিতে

পান নাই, বসওয়েল জনসনের সব কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া লোকে য়্যাবট ও বসওয়েলের সকল কথা বিশ্বাস করে না। লোক চিরকালই বলিবে যে যদি নেপোলিয়নের কোন দোষ ছিল না তবে কেন তাঁহার অধঃপতন হইয়াছিল কেন বসওয়েল এত বাজে কথা লিখিয়াছেন। জীবন-চরিতে এগারটি পুত্র ও তের জন আত্মীয়ের কথা লিখিবার আবশ্যক হয় না। সে রকম পুস্তক পাঠ করিলে কোন উপকার হয় না। একবার রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিতে মিথ্যা কথা লেখা হইয়াছিল। কথাটা এই যে. রামমোহন রায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্য রামজয় বটব্যাল এবং গ্রামের লোকেরা রাজা রামমোহনের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিয়াছিলেন কিন্তু সিভিলিয়ান ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন নিজেই মোকর্দ্দমা করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে জীবন-চরিত পাঠে লোকের রুচি ভিন্ন অন্য কথা জানিবার সুবিধা হয় না। কেবল পুস্তকের কাট্‌তির দিকে লক্ষ্য রাখাই তাহার কারণ। যাহা হউক জীবন-চরিত পাঠে অনেক কৌশল শিক্ষা হয় এবং বড়লোকেরা বিপদে পড়িয়া কিরূপে উদ্ধার হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নচেৎ সেক্ষপীয়ারের জীবন-চরিত পাঠ করিয়া কেহ সেক্ষপীয়ার হয় নাই। কণাদের জীবনী পাঠ করিয়া কেহ কণাদ হয় নাই। জীবন-চরিত লিখিতে হইলে উপন্যাসের মত লেখা উচিত নহে। সত্যানুরাগী, হওয়া আবশ্যক। সত্যের জন্যই রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয়ের স্বরচিত জীবনী এত আদৃত হইয়াছে। সত্যের জন্যই গীবণ দ্বাদশবার তাহার বিশ্ব বিশ্রুত ইতিহাস (Roman Empire) সংশোধন করিয়াছিলেন একথা স্মরণ থাকা উচিত। জীবন-চরিতে কোন কথা বাড়াইয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই।

মুনি ঋষিদের জীবনী সংগ্রহ করা দুরুহ ব্যাপার, কেহ কিছু লিখিয়া যান নাই। যদি লিখিয়া গিয়া থাকেন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হারীত, গৌতম, যাজ্ঞবল্ক, শাতাতপ ও সাণ্ডিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণের জীবনী লেখা হয় নাই তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে? যাহা হউক জর্জ অফ ক্যাপাডোসিয়ার উপাখ্যান পাঠ করিলে যেমন লাভ হয় শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, অগ্রদ্বীপের কৈলাশপতি, বীরবকেশ্বরের খাকীবাবা, পূর্ব্বস্থলী চুপীর তারা ভট্টাচার্য্য, কাশীপুরের মহিম চক্রবর্ত্তী ও তারাপীঠের বামা-ক্ষেপার কথায় সেই রকম লাভ হয়। কারণ তাঁহারা অন্তর্জগতের লোক ছিলেন আর আমরা অন্তর্দৃষ্টি বিহীন।





মুক্তি।

রামানুজ প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন যে, জীব সকল ঈশ্বরের অংশ। আবার অন্যে বলেন, ঈশ্বর হইতে জীব উৎপন্ন অথচ ঈশ্বরের অংশ। "প্রথমোক্ত মতে সূর্য্য-কিরণের সহিত সূর্য্যের যেরূপ অংশাংশি ভাব, জীবের সহিত ঈশ্বরের সেইরূপ অংশাংশি ভাব। সুতরাং জীবও ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য।" এখানে ঈশ্বর সূর্য্য আর জীব তন্নিঃসৃত অংশু। দ্বিতীয় মতে অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। আবার ঈশ্বরে বিলীন হয়। এই মতে নির্ব্বাণ-বিরোধ নাই। কিন্তু প্রথমে যাহা হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের সহিত সেব্য-সেবক, প্রভু-ভৃত্য, অথবা পতি-পত্নীর ন্যায় ভোক্তৃভোগ্য ভাব ব্যবস্থাপিত আছে। এই মতে ঈশ্বরে জীবের লয় হয় না—কিরণ যেমন সূর্য্যে পুনর্গমন করে না, সেইরূপ জীবও ঈশ্বরে লীন হয় না। সাংখ্যকার বলেন,—আত্মা যদি ঈশ্বরের অংশ হয়, তাহা হইলে তৎ-সদৃশ শক্তি জীবের নাই কেন? অগ্নির অংশ স্ফুলিঙ্গে অগ্নির শক্তি আছে। আত্মা ঈশ্বরের অংশ হইলে তাহাতে ঈশ্বরের শক্তি থাকিবে। তবে কি ঈশ্বর উপাসনাসিদ্ধ মুক্ত আত্মা? হরি-হর, ব্রহ্মা প্রভৃতি কি ঐ প্রকারের ঈশ্বর? তাহা হইলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে,

তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব উপাসনা প্রভাবে উৎপন্ন। স্বতন্ত্র ঈশ্বরকে প্রমাণে পাওয়া যায় না কিন্তু পতঞ্জলি বলেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তিনি সকলের জ্ঞানে নিশ্চিত ও বিরাজিত আছেন। ক্লেশ, কর্ম্ম, জাতি ও আয়ুর্ভোগ প্রভৃতি জীবধর্ম্ম যাহাতে নাই এবং যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর। যে সকল দোষ মানবাত্মায় আছে, সে সকল যদি বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে সেই মানবাত্মা ঈশ্বরাত্মা বুঝিবার দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে। সুখ দুঃখ মোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম তিরোহিত হইলেই আত্মায় মুক্তি হয়। সাঙ্খ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— "তেন নিবৃত্ত প্রসবমর্থ বশাৎ সপ্তরূপ বিনি বৃত্তাম্,

প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিত স্বচ্ছঃ।"

অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞানে প্রকৃতির প্রসব শক্তি নিবৃত্তা হয়। যে আত্মায় প্রকৃতি দর্শন হয়, তাহার আর ধর্ম্মাধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য-নৈশ্বর্য্য জ্ঞানা-জ্ঞান থাকে না। লৌকিক উপায়ে সকল দুঃখের প্রতিকার হয় না; হইলেও তাহা আত্যন্তিক নহে। সেই দুঃখ আবার হয় সেই জন্য বিবেকী লোকেরা লৌকিক উপায় ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করেন। এই চরাচর জগৎ চৈতন্যের বিবর্ত্ত মাত্র অর্থাৎ অবিদ্যা বশতঃ চৈতন্য হইতেই মিথ্যা স্বরূপ এই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় মিথ্যাভূত জগৎ বিসর্জ্জন করত একমাত্র সত্যস্বরূপ চৈতন্যেই আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। আমাদের ষড়দর্শনে সেই কথার উপক্ষেপ আছে। জীবের দুঃখ দূর করা সকল দর্শনকারেরই উদ্দেশ্য। *

* (১) "বেদান্ত বলেন—ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতাই মুক্তি, (২) পতঞ্জলি বলেন—স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি, (৩) সাংখ্য বলেন—আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হেতু কৃতাকৃত্য তাই মুক্তি, (৪) ন্যায় বলেন—আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি, (৫) বৈশেষিক বলেন—পদার্থের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য জ্ঞান দ্বারা যে দুঃখ নিবৃত্তি তাহাই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি, (৬) মীমাংসকের মতে বৈদিক কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেই মুক্তিলাভ হয়।

পার্থক্য জ্ঞান লাভের উপায়-পরম্পরা-নির্দ্দেশে তারতম্য আছে বটে কিন্তু সাঙ্খ্যে যাহা প্রকৃতির বিকৃতি বেদান্তে তাহা মায়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সে জন্য শাস্ত্রাদেশ ও গুরুবাক্য পালন করিয়া তন্নির্দ্দিষ্ট পথে গমন, চিত্ত জয় করিবার জন্য সমাধির অনুষ্ঠান, একাগ্রতা স্থাপনার্থ জপাদিতে অবহিত চিত্ততাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।

মুক্তিকোপনিষৎ বলেন—

বাসনাক্ষয় বিজ্ঞান মনোনাশ মহামতে।
সমকালং চিরভ্যস্তা ভবন্তি ফলজ্ঞানতঃ॥

২য় অ. ১১

অর্থাৎ বাসনাক্ষয়, বিজ্ঞান ও মনোনাশ এই তিনটী কার্য্য সমকাল অভ্যাস করিতে যত্নবান হইবে। এই প্রকার বহুকাল অভ্যাস করিলে ফল লাভ হয়। দীর্ঘকাল যোগসাধন করিলে চিত্ত স্থিরত্ব প্রাপ্ত ও বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে। মন বৃত্তিশূন্য হইলে বিজ্ঞান ও বাসনা আপনা হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। বাসনা ক্ষয় হইলে কিছুতেই স্পৃহা থাকে না এবং স্পৃহাশূন্য হইলে সকল বন্ধন দূরীভূত হইয়া জীব মুক্তিলাভ করে।



পরিশিষ্ট।

CARDINAL FACTS.*

TO THE EDITOR OF THF EPIPHANY.

DEAR SIR,—It is possible for a rational person to prove that all religions are equally good and that Western scientists teach nearly the same doctrine as was taught of old in the Vedanta. The Western scientists discern unity in diversity and the Hindu philosophers see that every phenomenon is not separate from the One who pervades, orders and controls the Universe. Almost all religions recognise five main articles as in the following :—

(1) That there is a Supreme GOD.

(2) That He ought to be worshipped.

(3) That virtue and purity are the main parts of that worship.

(4) That sins should be repented of.

(5) That there are rewards and punishments in a future state.

Man's progress towards higher life no doubt very much depend on himself but there is a continuous warfare going on between his higher and

* Ephiphany November 21, 1908.

his lower self. Accepting a doctrine of Evolution as propounded by Hegel we must take the man as explaining the animal and the organic as exhibiting what is latent and obscure in the inorganic and in order to develop the principle must manifest itself in different forms which inevitably come into conflict with each other but are ultimately subordinated to the unity which they express. Concrete elements embodying the soul of truth are bad measured by absolute standard and good measured by relative standard. They are needful accompaniments of human life severally fitted to the societies in which they are indigenous.

Yours faithfully
JIBON DAS BANERJI.

[Our correspondent must be curiously ignorant of the religions of the world, or he could never have laid down his five propositions as containing truths common to them. There are forms of religion the followers of which do not hold a single one of these propositions.—ED., *E.*]

THE HOWRAH MUNICIPALITY.

To the Editor of the Indian Mirror.

Sir,—You know that of all great human contrivances contributing to the health of civilized communities, in which our present scientific age justly claims preeminence the drainage system plays no insignificant part. It is no deviating from the truth to say that the excellence of this system keeps pace with the civic properity of countries—a landmark, as it were that counts the strides to the goal of civilisation. The perfect drainage systems of Paris and London are but unmistakable signposts of progress in the science of sanitation. If among the many golden laws that Medical Science lays down for the health and life of human creatures one is to be rated above the other, it is cleanliness that next to food and drink conduces to longevity. The history of the civic progress of Paris is the history of its sewers. A part of the *cloaca maxima* of ancient Rome still points the truth of its being once the mistress of the then world. The small number of deaths in London in comparison to its immense population is in some measure owing to the excellence of her drainage. But keeping aside the mention of

countries basking in the light and culture of Europe of the Nineteenth Century, let us see how far our poor old backward country has been successful in its imitation of them. The rapid clatter of English civilisation has already reached our obtuse ears. Calcutta, Bombay, and Madras have been particularly happy in their systems of drainage—and Calcutta, the most so. But side by side which the bright silvery current of wealth and civilisation rolls the black mass of misery and destitution: the contiguity of light and darkness serves but to accentuate the hideousness of the latter, side by side with the admirable underground draining pipes of Calcutta, are the horrid gutters and wretched gullies of Howrah. Some of these gullies and gutters run through the very heart of the town, their courses of loathsome offensive filth spreading poison as like wounded snakes they drag their slow length along and there are, many that do not see the face of day Hyperion at all—offering their impenetrable visards of weed to its disinfectant rays choked and crammed with every description of sordid filth and foul offals—hotbeds of malaria, breeders of cholera and sties of miasma.

These—*nardamas* are from 2 to 3 by 3 to 4ft.

almost all of them flat and level and overgrown with thick and rankling sedges. But tarry a little, there is something else! Each block has its *pagars* or *dobas* a handsome admission to these *nardamas* These *pagars* or more properly cesspools are for the most part, halfcrammed-repositories of all sorts of nuisance—horrid and gaping mouths exhaling infection! Let us trace the sanitary consequence of a rainy season. The rain sets in from June, these *nardamas* and *pagars* are filled to the brim with water by the end of August; decomposition of the vegetable organisms commences; immense quantities of pestiferous gases are liberated; as the water dries up there issues a noxious stench to stifle the passers-by and you inhale germs of contagious disease as you breathe of this foul atmosphere. This process of oxidation continuues up to the end of December. Are the miserable inhabitants spared for the remaining five months of the year? Alas—No! The water pumps by the road-side carry on and complete the work left unfinished by the rain. The surplus amount of water drawn at each pump finds outlet through these *nardamas*—continuing the work of stagnation and infection throughout the year: no respite to us, poor inhabitants

Now, has not this foul system of drainage something to say for the number of deaths taking place during the year—from cholera, from small pox, from malarial fever? what is our Municipality doing? High rates wring out our last farthings, —do they disappear in the Serbonian Bog? Heaven alone knows? There had been a proposal to improve this state of things—but the promised remedy is as far off as ever. Has the plan flashed in the pan? If the improvement is at all to be, let it come soon we have suffered much and do suffer more we entreat our Municipal authorities to turn their attention a little this way and put a speedy check to this suffering of ours.

Yours &c.,

May 27, 1897. Jibondas Bannerjee.

KRISHNAISM.

TO THE EDITOR OF THE EPIPHANY.

SIR,—Young India steeped through to their lips in the lore of the West know very little of Srimadbhagbat and other scriptural works which enable us to look back through the vista of ages and Sree Krishna developing men to receptivity of larger communications of his grace and reveal-

ing himself with ever increasing glory. The key-note of Krishnaik philosophy is Prem or Love. This seeks to embrace the whole humankind with equality and is manifested throughout the life and works of Krishna as something above the sensuous gratification; something above the fruition of desire and something above the subjection of self-consciousness. It would be misunderstanding the great object of life if we identify the esoteric significance of Braja Lila with moral impropriety and indecorum and make it the subject of unmerited slur and ridicule in pulpit orations. It is unworthy of those who hold up the torch of spiritual enlightenment to humanity. The principle of religion in all its branches is deeply rooted in the Indian character simply because the concept is grounded on knowledge external and internal. The internal knowledge corstitutes the essentials of Krishnaism and is dependent on the external. The reason for that is obvious known unless you know the meterial. Braja Lila is one of the beautiful allegories illustrating the principle of spiritual unification with God by Love. Bound ~~the spiritual cannot be~~ to world of sense and shut up within the life of selfish appetites, man does not always conceive

the nobleness of life, the ideal of his being or his true weal. The avowed mission of Krishna was to make up for inadequacy of Dharma on earth and in the fulfilment of his mission he was as successful as JESUS CHRIST or Gautama Buddha. To accept love and nothing but love towards liberation is the modus of his culture. It is the noblest men who most feel its power and excellence consfsting in its inestimable ethics and its lofty purity. There is a sequence of rationalism in saying that God is love and must beloved in return.

Krishnaism will therefore always be found to win unwilling homage of those who examine it, through and through, to discover if they can spots that mar it.

HOWRAH,

The 12th August 1899.

| 1. If the licentious legends of the Purana are really edifying allegory, how comes, it that the chief modern apologist of Krishna, Bankim Chandra, rejects them as spurious and unworthy additions to the true history of hero?

2. Our point is that moral impropriety can never edifying, whether figuring as history or allegory, but always disedifying and demoralising.

The result of this is visible in the moral decay of Vaishnavism, and attempts of scholars like Bankim Chandra to rid these immoral literary accretions Illicit lust can symbolise Divine Love: rather it hideously degrades that holy concept To speak of lofty ethics in this connection is too painfully ludicrous.

3. If Krishna, as you say, was as sucessful as CHRIST in the propagation of Divine Love, his work should have read throughout the globe, as CHRIST has done instead of remaining the religion of Hindus only, and of only one sect of them. Krishna lived many centuries before CHRIST, yet his as not even yet conquered India, or Hinduism,—much less spread beyond it. Facts are against you.

4. The reason is that Christianity teaches the *prem* true and the true *bhakti*, uustained by low and sensuous associations. Not Radha leaving her lovers and husband for Krishna's sinful embraces, but Mary Madalene, the woman that was a sinner, leaving with her hair, receiving His absolution, and abandoning all sin for His pure service, is the true ethical type of the soul's relation to her Incarnate Saviour.—ED, *E*.]

RETRIBUTION AFTER DEATH.

TO THE EDITOR OF THE EPIPHANY.

DEAR SIR,—Permit me to ask you through the medium of your esteemed journal if you have reasons to believe the account in connection with Vasco de Gama, the famous Portuguese discoverer, who treated the Indians of the Malabar Coast with savage ferocity as laid down by the author of "Discovery in Strange Lands" in illustration of retribution after death. "The fishermen of Malabar Coast see a strange sight · at the dead of night, they see a bearded Feringee (European) flying with shriek after shriek—all of them piercing and unearthly and heartrending--to escape from his numerous pursuers, but is eventually caught and cut to piece." We have the authority of the *Review of Reviews* to say that the scene is enacted again and again, even now, and the story is told by the Indian, and European eye-witnesses.

Yours faithfully,
JIBON DAS BANERJEE.

[We believe in retribution after death, but we should be sorry to rest our belief on such a wild story.—ED., *E.*]

Epiphany January 19, 1907.

সমাপ্ত।